জ্ঞান-প্রবেশিকা

(সাধনার ধন)

"বেদ-প্রবেশিকা" ও "সাংখ্য দর্শন"

প্রণেতা

পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয়

উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বিদ্যালঙ্কার,

এম.এ. সি.এস, পি.আর. এস্

মহাশয়ের

অনুজ

রায় সাহেব শ্রীমহিমচন্দ্র বটব্যাল

রেজিষ্ট্রার অব্ এ্যাসিওরেন্সেস্, কলিকাতা,

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হাওড়া,

১ নং দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় রোড,

দুর্গাবাটী হইতে

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বটব্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯।

মূল্য ॥৵০ মাত্র।

মুখবন্ধ।

জ্ঞানের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তত্ত্বজ্ঞানলাভ দ্বারা মনুষ্য বদ্ধাত্মার মুক্তাবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন এবং দেহান্তে মুক্তি লাভ করেন। এই তত্ত্বালোচনা শ্রীগীতা বেদের প্রতিধ্বনি তুলিয়া যেরূপ দেখাইয়াছেন প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া **জ্ঞান-প্রবেশিকা** রচিত হইল। আশা করি ইহা পাঠে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের গূঢ় বাক্যের রহস্য কথঞ্চিত উদ্ঘাটিত হইবে। জ্ঞান অনন্ত। সেই অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার অন্বেষণ করা বর্ত্তমান সময়ে অর্থসঙ্কটাপন্ন ও ঘোর বিষয়াশক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই সাংসারিক কার্য্যে, অর্থ উপার্জ্জনে ও আহার বিহারাদির দ্বারা দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকি, কখনও ভাবিবার অবসর হয় না যে দেহান্তে আমাদের কি দশা ঘটিবে। এই ভাবে আমরা কত জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃথা সময় কাটাইয়াছি ও কাটাইতেছি কিন্তু জন্মের যে শেষ কোথায় একবারও তাহা ভাবি না। মৃত্যুর পর জন্ম আছেই, ইহা বেদবাক্য, মিথ্যা হইবার নহে। বহু লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, এই মনুষ্যজন্ম দেবজন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়।

অতএব এমন দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি 'মুক্তাত্মা' হইতে না পারি তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সে জন্য প্রধানতঃ সাধন চতুষ্টয়ের আশ্রয় লাভ করিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা বিধেয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের দ্বারা আমাদের সমুদয় কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, সেই গুণত্রয়ের স্বভাব এবং কার্য্যা কার্য্য সম্বন্ধে অবগত হইতে না পারিলে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞানই মুক্তি প্রদান করে। ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কে না চিরসুখী ও শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন? কিন্তু পারেন না কেন? তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়াই তাহার কারণ। এই গ্রন্থে সেই সকল তত্ত্বকথা সরল ভাষায়, সুকৌশলে ও শাস্ত্রীয় বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও নিয়মানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে আশা করি নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক জন্মিবে, হৃদয়ে পূর্ণ বল, বিমল আনন্দ ও প্রসন্নতা জন্মিবে, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও সংসারের সুখ দুঃখে উপেক্ষা বুদ্ধি জন্মিবে এবং ক্রমে শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে স্থিতিলাভের যোগ্যতা আসিবে। একাধারে নিত্য আবশ্যকীয় ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানবের অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা ধর্ম্মগ্রন্থের সারভূত বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্ব সাধারণের হস্তে ইহা অর্পণ করিলাম। পাঠক বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় এই আশঙ্কায় অল্প কথায় সারতত্ত্বের মিমাংসা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ যাঁহারা সুবৃহৎ ও নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতে অসমর্থ তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অল্লায়াসে অধ্যয়ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ইহা পাঠে যত্যপি কাহারও কিছু মাত্র উপকার হয় তবে আমার শ্রম ও উদ্দেশ্য সফল জ্ঞান করিব।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমান সময়ে ২৭ বৎসরকাল ধর্ম্মবিষয়ে

বিখ্যাত **উৎসব** নামক মাসিক পত্রিকাতে **জ্ঞান-প্রবেশিকা** প্রবন্ধাকারে প্রচারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেগুলি অনেকেরই দৃষ্টাকর্ষণ করিয়া থাকিবে। প্রবন্ধগুলি যাহাতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বন্ধুবর্গের উৎসাহে ও অনুরোধে এবং সাধারণের কল্যাণ কামনায় আমি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। প্রবন্ধগুলি "উৎসবে" প্রকাশিত হইবার পর পুনরায় আলোচনা করিয়া আরও সরল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজন অনুসারে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট অধ্যায়ে কতিপয় সুললিত সংস্কৃত স্তব ও প্রার্থনা এবং পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের বর্ণমালা অনুসারে সূচীপত্র প্রদত্ত হইল।

বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজে যুবকদিগের জন্য ধর্ম্মবিষয়ক ও চরিত্র গঠনোপযোগী তেমন বিশেষ কোন পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট না থাকায় মন শুদ্ধির উপায় ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম এবং সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই পরিজ্ঞাত হইবার সুবিধা পান না। আশা করি তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইয়া যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও জীবনে শান্তি ও সুখলাভ করিবার পথে আইসেন তবে আমারবাক্ সহায়ে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভে কিছু সুবিধা হইল মনে করিয়া আমিও আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। অলমিতিবিস্তরেণ।

১নং দয়াল ব্যানার্জি রোড,
"দুর্গাবাড়ী"
বাজে শিবপুর, হাওড়া
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯।

গ্রন্থকার

শ্রীমহিমচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ।

বন্দনা।

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে
ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশায় সংসার দুঃখহারিণে ॥

শিবতত্ত্ব প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥

নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাব প্রকাশিনে।
জ্ঞান জ্ঞান স্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দ রূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলি কলাত্মনে ॥

নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ।
মমেপ্সীতং ফলং দত্বা প্রসীদ দেহি নির্ব্বৃতিং ॥

শ্রীমহিমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ, বটব্যাল

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রামীন বন্দ্যোবংশীয়

পরমারাধ্য

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ৺ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্মণঃ

শিরোমণি অভীষ্টদেব মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে

উৎসর্গ।

যিনি সংসার অরণ্যের নিগূঢ় পথ প্রদর্শক, যিনি জ্ঞানাঞ্জন
শলাকার দ্বারা হৃদয়ের তিমিরান্ধকার দূর করেন,
যিনি হোতার স্বরূপ হইয়া শ্রীভগবানের নিকট
শিষ্যের মঙ্গল সাধনে সতত তৎপর থাকেন,
যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভববন্ধন হইতে
মুক্ত করেন, সেই পরম কারুণিক
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে এই ভক্তি
অঞ্জলি "জ্ঞান-প্রবেশিকা"
অর্পণ করিলাম।

প্রণত সেবক—

শ্রীমহিমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ
(বটব্যাল)

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

মুদ্রাঙ্কন দোষে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে তন্মধ্যে প্রধানত অশুদ্ধ বাক্যগুলির শুদ্ধি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
/০	৬	শ্রীকৃষ্ণানুর্জ্জনের	শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের
৵০	৭	তন্ত্বকথা	তত্ত্বকথা
๗/০	১০	অলমিতি	অলঁমতি
১৭	১	পানী	পাণি
২১	১৫	বছিতে	বুঝিতে
২৮	৯	প্রারদ্ধ	প্রারব্ধ
৩৪	২১	সর্ব্বস্ব্য	সর্ব্বস্ব
৫৭	১	এই ব্রাহ্মণ	এই জন্য ব্রাহ্মণ
৬৩	৮	সংশয়ঃ	সংশয়ঃ
৬৭	৭	পরিশিষ্ট অধ্যায়	ষষ্ঠ অধ্যায়
৭১	১৯	দেছ	দেহ
১০৭	৪ (৪র্থশ্লোক)	গতিস্ত্ব	গতিস্ত্বং
১০৯	১	জগৎকত্রি	জগৎকর্ত্রী
১০৯	১	জগদ্ধাত্রি	জগদ্ধাত্রী
১১০	৬	সমাশ্রয়স্তং	সমাশ্রয়স্ত্বং
১১০	৭	অনন্তমূর্ত্তিরদঃ	অনন্তমূর্ত্তিবরদঃ
১১৩	৬	বিক্ষেপঅর্থ-৪।২১	বিক্ষেপঅর্থ-৪।৪

নন্দন প্রেস।
৩৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরথচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান—

১। প্রকাশকের নিকট,
১নং দয়াল ব্যানার্জি রোড,
দুর্গাবাটী ;
বাজে শিবপুর, পোঃ আঃ শিবপুর
জেলা হাওড়া।

২। কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব আপিস ;

৩। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ,
১৫নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা।

৪। গুরুদাস লাইব্রেরী,
২০৩।২।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

ও কলিকাতার অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

জ্ঞান-প্রবেশিকা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

হে মানব! তোমরা কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছ, বিশ্বসংসার কিরূপেই বা উদ্ভব হইয়াছে, তোমাদের দেহ কি এবং তদভ্যন্তরে কি কি বস্তু আছে এবং তাহারা কে কোন্ ভাবে কি কার্য্য করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহল হয় না কি? ইহ-সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহ রক্ষা, দেহের সৌন্দর্য্য সাধন, ধনসম্পত্তি ও যশ উপার্জ্জনের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকি। কখনও ভাবি কি, সেই সকলের দ্বারা আমাদের কি পরমার্থলাভ হয়? জীবের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য জন্মকে "দেব জন্ম" বলা যায়। মনুষ্য জীবন লাভদ্বারা পরমাত্মলাভ করা যায়। ঈশ্বর নিকৃষ্ট জীবদের অন্তঃকরণে যে সকল মহৎ ভাব প্রদান করেন নাই, মনুষ্য জীবনে তৎসমুদায় প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল দান প্রাপ্ত উচ্চভাবের অনুশীলন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ যাহাতে তাঁহাকে জানিতে পারি এবং এই দুঃখময় সংসার হইতে চিরমুক্তি প্রাপ্ত হই ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

নতুবা নিকৃষ্ট জীবে ঐ সকল মহৎ ভাব প্রদান না করিয়া মনুষ্যজীবনে তিনি সে সকল ভাবের অভ্যুদয় করাইলেন কেন? এই মহত্তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে বহু চেষ্টা ও একাগ্রচিত্তে বহু গবেষণার আবশ্যক। সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বিরক্তিজনক, কর্কশ ও কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বিষয়টি জটিল, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমার্হ।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল ইহা সর্ব্ব প্রথমে জানিতে হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য কেবল **'সৎ'** মাত্র ছিলেন। শ্রুতি প্রমাণ যথা "সদেব সৌম্যে-দমগ্র আসীদিতি"। এই 'সৎ' এ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বভাবতঃ বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তির নাম **'মায়া'**। যখন সেই মায়াশক্তি 'সৎ' এ স্ফূরণ বা স্পন্দন হয় সেই স্পন্দনে "সঙ্কল্পাত্মিকা মায়া" উত্থিত হয়েন, তখন সেই মায়া হন **প্রকৃতি**, আর "সৎ" হন **পুরুষ**। মায়া শক্তির স্পন্দনে মহাশূন্যে একটা চলন বা স্পন্দন হয়, তাহাই "শব্দ" এবং শব্দই ব্রহ্মবাচ্য বলিয়া কথিত হয়। 'সৎ' শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। যখন ঐ পুরুষ মায়ার প্রথম

বিকার মহতে বা মহৎব্রহ্মে আপন সঙ্কল্পরূপ সৃষ্টিবীজ আধান করেন তখন জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মণিতে ঝলক উঠিলে যেমন তাহার পৃথক সত্ত্বা দৃষ্টি হয় তদ্রূপ 'সৎ'এ মায়া উঠিলে জগতের দৃষ্টি হয়। ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা,—

"আত্মা বৈ ইদম্ একম্ অগ্রে আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চ-নাসীৎ তদিদং সর্ব্বম্ অসৃজৎ" অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র "আত্মাই" ছিলেন এবং আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আত্মা শব্দে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য 'সৎ' মাত্রই প্রতিপাদিত হয়। অতএব 'সৎ' ও 'আত্মা' একই বস্তু।

আত্মার শক্তি "মায়া"। "মায়া" সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ বিশিষ্ট। এই গুণত্রয় মায়া হইতে উৎপন্ন।

সত্ত্বগুণের বৃত্তি—শুভ কামনা, হর্ষ, নিষ্ঠা, প্রীতি, আনন্দ ইত্যাদি।

রজঃ গুণের বৃত্তি—বিষয় ভোগের ইচ্ছা ও ক্রোধ, দ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদি। বিষয় শব্দে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শকে বুঝায়।

তমোগুণের বৃত্তি—শোক, দুঃখ, ভয়, মোহ, শ্রম, তন্দ্রা, আলস্য ইত্যাদি। এই শক্তিও দুইভাগে বিভক্ত হয়, যথা, "মায়া" ও "অবিদ্যা"। আত্মার প্রতিবিম্ব

সংযুক্ত রজঃ তমোগুণে অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে "মায়া" কথিতা হয়। আর আত্মার প্রতিবিম্ব সংযুক্ত রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত মলিন সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে "অবিদ্যা" বলিয়া কথিতা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে 'মায়া' ও মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে 'অবিদ্যা' উক্ত হয়। যে সত্ত্বগুণের বিকাশ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ আপনা হইতে বশীভূত হয় তাহাকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ কহে। আর যে সত্ত্বগুণ প্রকাশ সত্ত্বেও রজঃ ও তমোগুণ বশীভূত হয় না বরং সত্ত্বগুণ রজস্তমের অধীন হইয়া পড়ে তাহাকে মলিন সত্ত্বগুণ কহে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান যে 'মায়া' তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে "চৈতন্য বা আত্মা" তিনি মায়াকে বশীভূত অর্থাৎ আত্মগত করিয়া "ঈশ্বর" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। আর মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান যে "অবিদ্যা" তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে "চৈতন্য বা আত্মা" তিনি অবিদ্যার অধীন হইয়া "জীব" উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। ঈশ্বর হইতেছেন মায়াধীশ, জীব হইতেছেন মায়াধীন।

অবিদ্যা শব্দে অজ্ঞান বুঝায়। অজ্ঞানের দুইটি শক্তি আছে। একটি 'বিক্ষেপ', অপরটি 'আবরণ'। বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে প্রথমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত এবং ক্রমান্বয়ে ওষধি ও অন্ন সকল ও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ

এই চতুর্ব্বিধ শরীর বিশিষ্ট জগৎ সমূহ ও তদন্তর্ভূত চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ভুবাদি লোক সকল ব্রহ্মে কল্পিত হয়। অবিদ্যাতে "আবরণ" শক্তি থাকায় সে জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে ভ্রান্তির উদয় করায়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। সুতরাং সে "জীব" আপনার অবিকৃত, অসঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, চিদানন্দরূপ দেখিতে না পাইয়া অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া পড়ে এবং অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে দেহাভিমান বশতঃ সঙ্কল্পিত সংসারে নিমগ্ন ও দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যা ৪ প্রকার, যথা—

১। অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, যেমন ব্রহ্মলোকাদি হইতে সাংসারিক সমস্ত বস্তুতে নিত্য বুদ্ধি।

২। অশুচি পদার্থে শুচি বুদ্ধি, যেমন আপন ও পুত্র ভার্য্যাদির অশুচি শরীরে শুচি বুদ্ধি।

৩। অসুখে সুখ বুদ্ধি, যেমন দুঃখ সাধনে সুখ সাধন বুদ্ধি।

৪। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি, যেমন অনাত্মা দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে "আমি" জ্ঞানরূপ আত্মবুদ্ধি।

মায়া অংশে আবরণ শক্তি না থাকায় ঈশ্বরের স্বরূপে আবরণ নাই। জীব ভ্রান্তি শূন্য হইয়া আপনার অবিকৃত, অসঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চিদানন্দরূপে সংস্থিত

থাকে। মায়ারও অবিদ্যার ন্যায় বিক্ষেপশক্তি আছে। বিক্ষেপ শক্তির গুণে জীব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত এবং চতুর্ব্বিধ শরীর, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ বিশিষ্ট জগৎ সমূহ ও চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবাদি লোক সকল ব্রহ্মে কল্পিত হয়। কল্পনা অর্থে যাহা হইবে না বা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিতে ভাসে তাহাকে বুঝায়। চতুর্দ্দশ ভুবন অর্থে সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গকে বুঝায়। ভুবাদিলোক বলিলে ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, ও সত্য এই সাতটি লোককে বুঝায়। জগৎ বলিলে চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবাদি লোক সকলের সমষ্টি বুঝায়। গমধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয়ে জগৎ অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদা গমন করে বা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হয়। জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কারণ পরব্রহ্ম উৎপত্তিহীন, অনাদি ও নির্বিকার। মায়ার অবিদ্যা অংশে এই বিশ্ব সংসার সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি, স্থিতি ও তাহাদের গুণধর্ম্ম)

এবারে দেখা যাউক দেহোৎপত্তি কি ভাবে হয় এবং তদভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদি ও ভূতাদি গুণযুক্ত হইয়া কিরূপ কার্য্য করে। সূক্ষ্মদেহে মায়াবী জীব মন ও ইন্দ্রিয়গণসহ পূর্ব্বজন্মের

প্রবল সঙ্কল্প যুক্ত অবস্থায় কারণরূপে স্থিতি লাভ করিয়া কার্য্যের প্রতীক্ষা করে। তজ্জন্য কর্ম্মবশে মায়াবী জীবকে অধঃপতিত হইতে হয়। জীব প্রথমে চন্দ্রমণ্ডলে আশ্রয় লাভ করে এবং চন্দ্রের শিশির বর্ষণে ভূমিতলে পতিত হয়, তাহার পর উদ্ভিজ্জরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ তাহা ভোজন করে এবং ভর্জ্জিত বস্তু বীর্য্যরূপে পরিণত হয় এবং তাহা স্ত্রীগর্ভে নিপতিত হইলে জরায়ু পরিবেষ্টিত কলল অর্থাৎ ভ্রূণ হইয়া কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে রুধির পরিপ্লুতা বুদবুদাকার ধারণ করিয়া মাংসপেশীরূপে পরিণত হয়। পেশী হইতে অঙ্গের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ এবং উদর উৎপন্ন হয়। দুই মাসের পর হস্তপদ, পার্শ্ব, কটিদেশ এবং জানু উৎপন্ন হয় এবং ক্রমান্বয়ে অঙ্গ সকলের সন্ধি স্থান, অঙ্গুলি, নাসা, কর্ণ, নেত্র, দন্তপঙক্তি, নখর, গুহ্য, কর্ণছিদ্র, পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ এবং নাভি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সর্ব্বশেষে শরীরের রোম সকল, মস্তকের কেশ এবং অবয়ব বিভাগ হয়। জীব পঞ্চম মাসে সকল রকমে চেতনা লাভ করে এবং সকল দেহের পরিপূরণ অষ্টম মাসের ভিতর হইয়া থাকে। মনুষ্যদেহ এই ভাবে উৎপন্ন হয় জানিবে। কর্ম্মই দেহ সম্বন্ধের কারণ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রমাণ যথা—

পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহারসংযুতঃ।
ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ
ভূত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভূজ্যতে ততঃ॥
রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীযোনিসিঞ্চিতঃ
যোনিরক্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্।
দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা রূঢ়ত্বমাপ্নুয়াৎ॥
তৎ পুনঃ পঞ্চরাত্রেণ বুদবুদাকারতামিয়াৎ।
সপ্তরাত্রেণ তদপি মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ॥
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী রুধিরেণ পরিপ্লুতা।
তস্যা এবাঙ্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতি রাত্রিষু॥

❁ ❁ ❁ ❁

জঠরে বর্দ্ধতে গর্ভঃ স্ত্রিয়া এবং বিহঙ্গমাঃ।
পঞ্চমে মাসি চৈতন্যং জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্ব্বশঃ॥

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সম্পাতি উপাখ্যান।
৮মঃ অঃ, ২০-২৪।৩১ শ্লোক।

শরীর ত্রিবিধ যথা **স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ** অর্থাৎ **বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ঃ** বিশ্ব শব্দে একটি স্থূল শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়। তৈজস শব্দে একটি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়, আর প্রাজ্ঞশব্দে একটি অজ্ঞান বা কারণ শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়।

বিশ্ব বা স্থূল শরীর। নিরাকার "ব্রহ্ম" **শক্তি স্বরূপে ও চেতনরূপে** সর্ব্বদেহে অবস্থান করিতেছেন। ঐ শক্তিচৈতন্য নির্গুণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভূত হয় বা এক ভাবাপন্ন হয় তখনই তিনি স্থূল শরীরে পরিণত হইয়া সকলের গোচরীভূত হন্। স্থূল শরীর ষড়্ভাবাপন্ন, যথা. ইহার উৎপত্তি, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়।

তৈজস বা সূক্ষ্ম শরীরঃ মায়াবিশিষ্টা জীব যখন স্থূল দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন তখন হস্তপদ শীতল হইয়া যায়, চক্ষুকর্ণাদি কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া অসাড় হয়, শুধু শ্বাস বায়ু চলিতে থাকে। সেই সময় মায়াবদ্ধ জীব কি করেন? তখন তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে আকর্ষণ করেন। পরে যখন শ্বাস-রূপী প্রাণবায়ুর স্পন্দন রহিত হইয়া যায় তখন মায়াবী জীব **ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে** লইয়া অন্য দেহে আশ্রয় করেন। সেই দেহের নাম "সূক্ষ্ম দেহ।"

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ আকর্ষণ করিয়া প্রবাহিত হয় জীবও তেমনি শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া যে সকল সঙ্কল্প প্রবল করিয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া এমন এক দেহ অবলম্বন করেন যেখানে ভূতপূর্ব্ব

প্রবল সঙ্কল্পযুক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদি স্বচ্ছন্দে ক্রিয়া করিতে পারে।

শ্রীগীতা প্রমাণ যথা—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় ! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

৮অঃ—৬

অর্থাৎ যে অন্তকালে যেমন যেমন ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে সে অন্তিমকালের তন্ময় ভাব অনুরূপ দেহ মন লইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। এই ভাবে জীব কর্ম্ম নিবন্ধন হেতু ইহ সংসারে আসা যাওয়া করিয়া থাকে ও সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, মুক্ত, বিমুক্ত ইত্যাদি নানা প্রকার দশা প্রাপ্ত হয়।

শরীরং পুণ্য পাপাত্যা মুৎপন্নং সুখ দুঃখ বৎ।

ইতি অধ্যাত্ম রামায়ণম্।

কারণ বা প্রাজ্ঞ শরীর: পৃথিবীস্থ সমুদয় দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক একীভূত পদার্থের ও বাহ্য দৃষ্টির বহির্ভূত সূক্ষ্ম শরীর সম্পন্ন যাবতীয় একীভূত বস্তু সমুদায়ের চরম অবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত যে কিছু থাকে তাহাকে "কারণ" শরীর বলে। ইহার অপর নাম "অজ্ঞান।" আমাদের সুষুপ্তি অবস্থাতে এই অজ্ঞান শরীর লাভ হয়।

'সৎ' এ মায়া শক্তি বিকাশিত হইলে সেই মায়ার প্রভাবেই "সৎ" বিশ্বাকাব ধারণ করেন। মায়া, সত্ব, রজঃ তমোগুণ সম্পন্না প্রকৃতি নামে খ্যাত সেই প্রকৃতি "আপনি আপনার" সৃষ্টি করিবার মানস করিলে ত্রিগুণাত্মক গুণে অর্থাৎ সত্ব, রজঃ তমগুণে বিজড়িত হয়েন। সত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে "মহত্তত্বের" উৎপত্তি হয়। পরে ঐ মহত্তত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃ প্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। আবার এই অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। ঐ সকল সূক্ষ্মভূত হইতে ক্রমশঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই দশটি ভৌতিক সৃষ্টি। অনন্তর সঙ্কল্পের সহিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু উৎপন্ন হয়। এই চতুর্বিংশতি তত্বই জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই ঐ ২৪ তত্ত্বের বিকার মাত্র। নিম্ন প্রদত্ত লতাকারে ইহা সরলভাবে বিবৃত হইল, যথা :--

বিশ্বরূপ (সগুণ ব্রহ্ম)
⋮
সঙ্কল্প (প্রকৃতি বা মায়া)
⋮ সঙ্কল্পে বিজড়িত মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—
⋮ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ এবং
⋮ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—
⋮ বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু।
মহত্তত্ত্ব (সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত)
⋮
অহঙ্কার (মহত্তত্ত্বের বিকার তমঃ প্রধান গুণে উৎপন্ন)
⋮
পঞ্চ সূক্ষ্মভূত (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।)
⋮
পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী।)

সৃষ্টিকর্ত্তা ত্রিগুণাত্মক গুণে বিশ্বরূপ ধারণ করেন এবং গুণবিকার হইতে সঙ্কল্পের উদয় হয়। সঙ্কল্প অর্থে একটি অব্যক্ত ভাবের উৎপত্তি বুঝায়। ইন্দ্রিয়গণ ঐ অব্যক্ত ভাবের ব্যক্তাবস্থা আনয়ন করে। এইজন্য ইন্দ্রিয়-গণ সঙ্কল্পাশ্রিত।

ইন্দ্রিয়গণ আবার স্ব স্ব উৎপত্তি ভূতের কার্য্য করে, যেমন আকাশ হইতে শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; বায়ু হইতে ত্বক্ ও পাণীন্দ্রিয় ; তেজ হইতে চক্ষু ও পাদেন্দ্রিয় ; জল হইতে রসনা ও উপস্থ : পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ ও পায়ু

উৎপন্ন হয়। উপস্থ শব্দে পুং বা স্ত্রী চিহ্নকে এবং পায়ূ শব্দে গুহ্য দেশকে বুঝায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কেবল ক্রিয়া সাধন করে মাত্র। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাশীল হয়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির কোনই চৈতন্য নাই। উহারা জড়। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে প্রাণের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রাণ অন্তর বহিস্থ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারে না এবং চালক অভাবে ইন্দ্রিয়গণও নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন চোর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেও নিদ্রিত অবস্থাতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ কিছুই জানিতে পারে না। অতএব দেহের মতই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত জড় পদার্থ জানিবে।

ইন্দ্রিয়গণ ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের দ্বারা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। রূপ রসাদি সূক্ষ্মভূত সকল ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য বিষয়। ইন্দ্রিয়গণে ঐ সকল গ্রাহ্য বিষয় উপভোগ জনিত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণানুসারে ষড়রিপু **কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য** উত্থিত হয় এবং ইহারা স্ব স্ব বৃত্তির কার্য্য করে ও দুরাকাঙ্ক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেহীকে কর্ম্মপাশে দৃঢ়াবদ্ধ করে। ঐ সকল ষড়রিপুকে বশীভূত করিতে

হইলে ঈশ্বর উপাসনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যান, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কার্য্যকরা আবশ্যক। রিপুগণ মানবকে এমন দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যে মানব তাহার প্রতিরোধ করিতে প্রায়ই সক্ষম হয় না। জ্ঞানের দ্বারা ও বিষয়ের পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন দ্বারা রিপুগণকে বশীভূত করিবার অন্যতর উপায় জানিবে।

এতৎসম্বন্ধে শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন যথা ঃ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ! ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্ ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২

ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—পুরুষের পাপাচরণের হেতু কি? শ্রীভগবান তদুত্তরে উপযুক্ত বাক্যামৃতের দ্বারা অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন, যথা, কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ক্রোধের অপর নাম অভিমান। ইহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র, উহাকেই মোক্ষ পথের বৈরী বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি, মলদ্বারা দর্পণ, এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা ইহা অর্থাৎ বিবেক আবৃত হইয়া থাকে ॥৩৮॥

জ্ঞানীগণের চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ এই কামই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে ॥৪০॥

অতএব তোমাকে বিমোহিত করিবার পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কামকে পরিত্যাগ কর ॥৪১॥

ইন্দ্রিয়গণ দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক, এইজন্য ইন্দ্রিয়-গণ দেহাদি বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত; মন

ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি আছে এজন্য সঙ্কল্পাত্মক মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; আর যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা জানিবে ॥৪২॥

দেহাভ্যন্তরে পাঁচটী কোষ বিদ্যমান রহিয়াছে যথা:— **অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।** আত্মা এই পঞ্চকোষে সংক্রান্ত হইয়া অনন্ত জগতে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জলাশয় শৈবালাচ্ছন্ন হইলে তন্মধ্যস্থ জল যেমন অপ্রকাশিত থাকে তদ্রূপ **আত্মা** স্বশক্তি হইতে সঞ্জাত অন্নময়াদি পঞ্চকোষ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হন না। গুটিপোকা যেমন আপন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে অবস্থান করিলেও তাহাকে বুঝা যায় না সেইরূপ আত্মা কোষ মধ্যে থাকিলেও তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না।

এই শরীর অন্নরসের বিকার মাত্র। পিতৃ-মাতৃ-ভুক্ত অন্নরস হইতে এই শরীর সঞ্জাত। আবার অন্নরস দ্বারা ইহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। আর অন্নরস শূন্য হইলে শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহার নাম **অন্নময় কোষ**। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, লালসা এই কোষের ধর্ম্ম।

প্রাণ পাঁচপ্রকার যথা, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও

ব্যান। ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বাক, পানী, পাদ, উপস্থ ও পায়ূর সহিত মিলিত হইয়া **প্রাণময় কোষ** নামে অভিহিত হয়। প্রাণময় কোষ হইতে চৈতন্যের উন্মেষ হয় এবং দয়া দাক্ষিন্যাদি গুণের বিকাস পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চপ্রাণ সম্বন্ধে নিম্নে বিবৃত হইল।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ মিলিত হইলেই তাহাকে **মনোময় কোষ** বলা হয়। এই মনোময় কোষ হইতেই "আমি" "আমার" ইত্যাদি বিকল্পের উদয় হয় ও বিভিন্ন নামের দ্বারা বস্তু পরিচ্ছিন্ন ভাবের উদয় হইয়া মনোময় কোষে প্রকাশ পায়।

নিজ নিজ বৃত্তি সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ, এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধি মিলিত হইয়া স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে **বিজ্ঞানময় কোষ** হইয়া থাকে। এই কোষ হইতে ভ্রান্তি ভাবের উদয় হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করায় এই বিজ্ঞানময় কোষ পুরুষের সংসার রচনার কারণ জানিবে।

-সংসার কাহাকে বলে ?

সংসরত্যস্মাৎ—

মিথ্যা জ্ঞান জন্য সংস্কাররূপ বাসনাএব সংসারঃ।

প্রিয়াপ্রিয় গুণযুক্ত নিজ অভীষ্টপ্রাপ্তির দ্বারা যে আনন্দ উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা হইতে মনে প্রীতি হয়

তাহারই নাম **আনন্দময় কোষ**। আসক্তি এই কোষের ধর্ম্ম।

শ্রুতি বা বেদ বাক্যের দ্বারা এই পঞ্চকোষকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত যিনি সাক্ষী ও জ্ঞান স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন তাঁহাকে **আত্মা** বলিয়া জানিবে। **আত্মা** স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ। ইহা দেহাভ্যন্তরস্থ মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি এবং বাহ্য বিষয় সকলকে যথা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে প্রকাশ করেন। আত্মাকে প্রকাশ করেন এমন কোন পদার্থই নাই। আত্মার জ্যোতিতেই এই দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। দৃশ্যমান পদার্থ হইতে দ্রষ্টা পৃথক। এই ন্যায় অনুসারে আত্মা দেহাভ্যন্তরস্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় হইতে যে পৃথক তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

শরীরাভ্যন্তরে পঞ্চপ্রাণ যথা :—**প্রাণ**, **অপান**, **সমান**, **উদান** ও **ব্যান**, বায়ুরূপে বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের স্থিতি স্থান যথা :—

হৃদদেশে স্থিত "প্রাণ"। তাহার ধর্ম্ম উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, অশন, পিপাসা ইত্যাদি।

গুহ্যদেশেস্থিত "অপান"। তাহার ধর্ম্ম মল মূত্রাদি ত্যাগ করণ। নাভিদেশে স্থিত "সমান"। তাহার ধর্ম্ম ভুক্ত অন্ন

পানাদি পরিপাক্ দ্বারা সার ও অসার ত্যাগ বিভাগ করণ।

কণ্ঠদেশেস্থিত "উদান"। তাহার ধর্ম্ম ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করণ এবং বমন, হিক্কা ও উদ্গীরণ।

সর্ব্বাঙ্গবর্ত্তীস্থিত 'ব্যান'। তাহার ধর্ম্ম সমস্ত শরীরে ভুক্ত অন্ন পানাদির সার রস সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহার পোষণ। এই বায়ু পঞ্চকের মধ্যে কোন একটীর বিকার-প্রাপ্ত হইলেই শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি স্থূল শরীর পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকৃত অবস্থা হইতে শরীরে নানা প্রকার উপাদান গঠিত হইয়াছে যথা ঃ—

পৃথিবীর অংশ হইতে উৎপন্ন—অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ী ও রোম।

জলের অংশ হইতে উৎপন্ন—শুক্র, রক্ত, পিত্ত, স্বেদও লালা।

তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি।

বায়ুর অংশ হইতে উৎপন্ন—গমন, ধাবন, উৎক্রমন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ।

আকাশের অংশ হইতে উৎপন্ন—শিরঃ, কণ্ঠ, হৃদয়, উদর ও কটি।

এই পঞ্চভূতের সমষ্টি অর্থাৎ মিলিত সত্বগুণ হইতে সঞ্জাত এক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার সেই অন্তঃকরণ বৃত্তি ভেদে চারি প্রকারে, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারে বিভক্ত হইয়াছে।

মনের বৃত্তি সঙ্কল্পাত্মিকা অর্থাৎ ভাবের নিত্য উৎপাদক।

বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ স্থিরিকরণ ক্রিয়া।

চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধানাত্মিকা অর্থাৎ অনুসন্ধান তৎপর।

অহঙ্কারেরবৃত্তি—অভিমানাত্মিকা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান—আমি কর্ত্তা। এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন ঃ—

অন্তঃকরণমেকং তচ্চতু র্বৃত্তি সমন্বিতম্।
মনঃ সঙ্কল্প রূপং বৈ বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা॥
অনুসন্ধানবচিত্ত মহঙ্কারোহভিমানকঃ।
পঞ্চভূতাংশ সম্ভুতো বিকারী দৃশ্য চঞ্চলঃ॥

মনের আবার একটী বিশেষ গুণ আছে। মন হইতে যেমন ভাবের উদয় ও লয় হয় তেমনি ইহার একটী শক্তি আছে যাহাকে **স্মৃতি** বলা যায়। এই স্মৃতি-শক্তির দ্বারা কর্ম্মের সংস্কার মনেতে ধারণ করে এবং অতীত ঘটনাবলি মনেতে স্থিতি লাভ করিয়া তাহা

মানুষের স্মরণ পথে আনয়ন করে। ইহার মধ্যেও আবার কিছু বৈচিত্র্যভাবলক্ষিত হয়। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার পর সাধারণতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সে যাহা কিছু করে বা দেখে তাহা মনে থাকে না এবং পঞ্চমবর্ষ অতীত হইবার পর যাহা করে বা দেখে তাহা কতক কতক মনে থাকে এবং বয়ঃবৃদ্ধি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে মনে স্থিতি লাভ করে। একই মন একই দেহে অবস্থান সত্ত্বেও তাহার বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অর্থাৎ স্মরণ ও বিস্মরণ উভয়ই দৃশ্য হয়, ইহার কারণ কি ? পঞ্চম বর্ষকাল পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ভেদাভেদ বিচার জ্ঞান জন্মায় না অর্থাৎ কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না, এই ভেদাভেদ বিচার জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি শক্তি উত্থিত হয় এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি অনুসারে স্মৃতি শক্তিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্যই মানুষের অতি শৈশব অবস্থার কথা মনে থাকে না। অতএব বুছিতে হইবে অজ্ঞান অবস্থার কথা আমাদের স্মরণ থাকে না।

পঞ্চমহাভূতের সর্ব্বদাই চেষ্টা তাহাদের স্ব স্ব ভূতে লয় প্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ পঞ্চীকৃত বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করাই তাহাদের ধর্ম্ম। এই জন্যই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জীবনের চঞ্চলতা সম্বন্ধে সুন্দর উপমার দ্বারা বলিয়াছেন যথা ঃ—

নলিনী-দল-গত জলমতি তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্ ।

অর্থাৎ পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতিশয় চঞ্চল।

অভিমানী জীব যে স্থূল শরীর ধারণ করে তাহার পাঁচপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ।

জাগ্রত অবস্থা যথা,—ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের ব্যবহার যোগ্য সময়কে জাগ্রত অবস্থা বলে।

স্বপ্নাবস্থা যথা,—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থার সংস্কার জন্য অন্তঃ-করণে যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে।

ইহাও দেখা যায় যে জাগ্রত অবস্থায় যাহা কখন করা বা ভাবা যায় নাই তাহাও স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ অন্তঃকরণ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির অধীন। ঐ শক্তি যখন অন্তঃকরণে লীলা করে তখন অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় বস্তুর দর্শন করাইয়া নানা প্রকার প্রহেলিকা উৎপন্ন করে। ঐ বিচিত্র শক্তি কি জাগ্রত কি স্বপ্নাবস্থা মানবের উভয়বিধ অবস্থাতেই তাহার ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সন্দর্শন করাইয়া থাকে। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা দর্শন করিলে প্রতীয়মান হয় যে আমরা জাগ্রত অবস্থায় যাহা কিছু

দেখি বা ভাবিয়া থাকি তাহাও মায়ার ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন এবং ঐসকলও স্বপ্নদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে অপসারিত হইলে তাহারা অন্তঃকরণে লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল লয় প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়দিগকে সঙ্কল্পাত্মিকা মায়া উত্তেজিত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব গুণবৃত্তিতে নিয়োগ করিলে সংস্কারঘটিত অন্তঃকরণে যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহা কল্পনা মূলক মিথ্যা ইহারই অপর নাম স্বপ্ন।

সুষুপ্তি অবস্থা যথা—কর্ম্মভোগের দ্বারা আক্লান্ত হইয়া জীব বিশ্রাম সুখ লাভের জন্য যখন স্বীয় কারণরূপ অজ্ঞানে অবস্থান করে তখন তাহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে, অথবা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ভাবাপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হয়—সেই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলা যাইতে পারে।

মূর্চ্ছাবস্থা যথা—আঘাত ঘটিত পীড়ায় অভি-ভূত অথবা বায়ু বিকৃতির জন্য জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব এমত অবস্থাকে মূর্চ্ছাবস্থা বলা যায়।

মরণাবস্থা যথা—শরীরে ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্ম নিঃশেষ হইলে এবং বর্ত্তমান স্থূল শরীর নাশ হইলে ভাবী শরীর প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে মধ্যবর্ত্তী সময় তাহাকে মরণাবস্থা বলে। অথবা মন ও ইন্দ্রিয়গণ রূপ-

রসাদি বিষয় হইতে এককালীন অপসৃত হইয়া পুনরায় উহাদের বিষয়ের সহিত মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যে কাল তাহাকেও মরণাবস্থা বলা যায়।

এই পাঁচ প্রকার অবস্থার মধ্যে সুষুপ্তি অবস্থা পরম রমণীয়। জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইলে যে কি আনন্দ তাহাই স্থূল দেহে উপলব্ধি হয়। জীব সকল এ সময় সকল রকম চিন্তা, ভয়, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। কেবল তাহাই নহে। ইহা ভগবানের প্রদত্ত জীবের "রক্ষা কবচ" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তার দ্বারা জীবের যে শক্তির অপচয় ঘটে তাহা এই সুষুপ্তি অবস্থাতে পূরণ হয়। এই ভাবে ক্ষয় ও পূরণ হইয়া জীবসকল তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। সুষুপ্তি কালে জীব কিছুই জানিতে পারে না, সকল ইন্দ্রিয়ই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহারা কোন প্রকার কার্য্য করে না। সুষুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া জীব কেবল মাত্র জানিতে পারে আমি কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত সুষুপ্ত ছিলাম। তাহার অতিরিক্ত কিছুই ধারনা করিতে পারে না। তবে কে জীবকে জানায় যে তুমি এত সময় সুষুপ্ত ছিলে? সে এক সাক্ষীরূপী **চৈতন্য**। সকল ইন্দ্রিয়ই ক্ষণকালের জন্য লয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু চৈতন্য

বর্ত্তমান থাকিয়া সাক্ষীস্বরূপে বলিয়া দেন **তুমি সুষুপ্ত ছিলে ;** এই চৈতন্যই আত্মা, তিনিই 'সৎ'। তাঁহারই উপর এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানব কর্ম্মবীজ আশ্রয় করিয়া জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করে। অতএব কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া চলা বিধেয়। কর্ম্মও পাঁচপ্রকার যথা :— নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ।

নিত্যকর্ম্ম, যেমন—সন্ধ্যা বন্দনাদি যাহা চিত্ত শুদ্ধির জন্য বেদে অবশ্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম—অর্থাৎ নিমিত্ত জন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়, যেমন পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ও চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহণোপলক্ষ্যে দান এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ার দ্বারা পিতৃলোকের সন্তোষ সাধনার্থে যে কর্ম্ম তৎসমুদয়ই নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। এই নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল চিত্ত শুদ্ধি। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে কর্ম্ম করা যায় তাহা নিমিত্ত কর্ম্ম হইলেও গুণভেদে তাহা কাম্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য। কারণ এই কর্ম্মে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মায় না অথচ ইহা না করিলেও চলে না।

কাম্য কর্ম্ম, যথাঃ—কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগরূপ ফলাকাঙ্খাকে কাম্য কর্ম্ম বলে, কাম্যকর্ম্মে আসক্তি জন্মে।

স্বাভাবিক কর্ম্ম, যথাঃ—পান, ভোজন, অটন, মল মুত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি দৈহিক কার্য্য সমূহকে জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম, যথাঃ—বেদ যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাদিগকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে। স্থূল কথায় বলা যাইতে পারে যে, যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মন গ্লানি প্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রিয়াদি ধ্বংস বা অকর্ম্মন্য হইয়া পড়ে এবং যে কর্ম্ম অপ্রকাশ রাখিবার জন্য সতত চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয় এতাদৃশ কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে।

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত ঐহিক ও পারলৌকিক দুঃখ ভোগরূপ যে ফল তাহাই প্রকৃত কর্ম্মফলরূপে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মফলের ভোগাভোগের জন্য জীবসকলকে নিয়ত জনম মরণরূপ সংসার মার্গে ভ্রমণ করিতে হয়। সংসারের প্রবর্ত্তক বলিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মকে "প্রবৃত্ত কর্ম্ম" বলে। মোক্ষ সাধন যে জ্ঞান তাহা "শ্রেয়"। আর প্রিয় সাধন যে জ্ঞান তাহা "প্রেয়"। এই শ্রেয় ও প্রেয় ইহারা বিভিন্ন এবং ইহারা পৃথক

পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। এই দুইএর মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি কামনা সাধনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, অতএব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

কাম্য কর্ম্মকে বাসনাযুক্ত কর্ম্ম বলা যায়। বাসনা দ্বিবিধ যথা, **শুদ্ধা ও মলিনা।** শুদ্ধা বাসনা জন্মবিনাশিনী, মলিনা বাসনা জীবের জন্মের হেতু। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগাদির বাসনাকে মলিনা বাসনা কহে। আর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ দ্বারা যে মুক্তি বাসনা তাহাকে শুদ্ধা বাসনা অর্থাৎ তাহা জীবের জন্ম বিনাশিনী বলিয়া উক্ত হয়।

আবার কর্ম্মের ফলানুসারে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় যথা "সঞ্চিত," "প্রারব্ধ" ও "ক্রিয়মান"। শাস্ত্রে কথিত হয় যে আশি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহণের পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। চারি লক্ষবার মনুষ্য জন্মের পর উত্তম মনুষ্য জন্ম হয়। এতাদৃশ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে প্রত্যেক জন্মগ্রহণে অসীম ও নানা প্রকার কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত কর্ম্মফল অসীম ও অনন্তরূপে সঞ্চিত হয়। তাহাদিগকে **সঞ্চিত কর্ম্ম**

বলে। সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে সমুদায় কর্ম্ম ফলোন্মুখী হয় এবং দেহে সেই উন্মুক্ত-কর্ম্ম-ফল যাহা ভোগ করা যায় তাহাকে **প্রারব্ধ কর্ম্ম** বলে। প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হইলে দেহের অবসান হয়। নূতন জন্ম পরিগ্রহের দ্বারা আবার শুভাশুভ কর্ম্মফল অর্জ্জিত হয় এবং সেগুলিও পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে, ইহজন্মে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ কেহ নিবারণ করিতে পারে না, তাহার ভোগ হইবেই হইবে।

ক্রিয়মান কর্ম্ম কি? প্রারব্ধ কর্ম্মের যে অংশ বর্ত্তমান কালে কার্য্য করিয়া ফলদান করিতেছে তাহাই **ক্রিয়মান কর্ম্ম**। তাহা সৎই হউক আর অসৎই হউক তাহার গতিরোধ করা যায় না। হস্তস্থিত তীর নিক্ষেপ করিলে অর্থাৎ তীর একবার হস্তচ্যুত হইলে তাহার যেমন গতি-রোধ করা যায় না, সে যেখানে যাইবার যাইবেই, তদ্রূপ ক্রিয়মান কর্ম্মের গতি রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। "কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নান্যথা" (অঃ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ডে ৬ অঃ ১০ শ্লোক)। তবে কি কর্ম্মফলের শেষ হইবার উপায় নাই? উপায় আছে। মায়া দুইভাগে বিভক্ত। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে "মায়া" আর মলিন সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে "অবিদ্যা"। অবিদ্যার আবার দুইটি শক্তি আছে একটি "বিক্ষেপ" অপরটি "আবরণ"। আবরণ

শক্তির দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করে। "বিক্ষেপ" শক্তির দ্বারা কার্য্য উৎপন্ন করে। "অবিদ্যা" কি বুঝিতে হইলে একটি ধানকে মনে কর। ধানের "আবরণ" ও "বিক্ষেপ" উভয় প্রকার শক্তিই আছে। অবিদ্যার আবরণ শক্তিগুণে যেমন জীবের স্বরূপ জানিতে দেয় না তেমনি ধানের আবরণ খোসাদ্বারা উহার ভিতরে যে চাল আছে তাহাকে আচ্ছাদিত রাখে। আবার যেমন অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা মিথ্যা কল্পিত কর্ম্মের উৎপত্তি হয় তেমনি ধানের খোসারূপ বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা অঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ খোসা লোপ হইলে অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। আমরা যদ্যপি অবিদ্যা ঘটিত কর্ম্মের "অবিদ্যা"কে ত্যাগ করিতে পারি অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক উৎপন্ন হয় তাহা হইলে কর্ম্ম কর্ম্মই থাকিয়া যাইবে, উহার আর পুনরুৎপত্তি হইবে না। কর্ম্মের উৎপাদিকা শক্তি ধ্বংস হইলে পুনর্কর্ম্ম উৎপন্ন হইবে না। পুনর্কর্ম্ম উৎপন্ন না হইলে তাহার ফলের সম্ভাবনা কোথায়? ইহা জ্ঞান মার্গের কথা, সাধনা ভিন্ন লাভ হইবার নহে। শাস্ত্র ইহার আরও সহজ উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয়কর কিন্তু অধীর না হইয়া ভোগ জনিত দুঃখ, ক্লেশ, অনুতাপের দ্বারা দগ্ধ করিতে থাক।

সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্।
দ্বয়মন্যোন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ ॥১৪
তস্মাদ্ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥১৫
(অঃ রাঃ ; ৬ অঃ অযোধ্যা কাণ্ড।)

অর্থাৎ সুখের মধ্যে দুঃখ আছে, দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে; জল ও পঙ্কের ন্যায় ঐ দুইটীই পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত। অতএব বিদ্বদ্‌গণ "সকলই মায়া" এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরতা সহকারে ইষ্টলাভে বা অনিষ্টলাভে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হন না। পাপের প্রায়শ্চিত্তই "অনুতাপ"। অনুতাপানলে কর্ম্মফল ভস্মীভূত হইবে। দেখ ধানকে অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া তাহাকে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিলে আর অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপযুক্ত হয় তাহার পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে উক্ত হইয়াছে যথা—

প্রাতর্নিশি তথাসন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥২।৬।৩৭

অর্থাৎ প্রাতঃকালে, রজনীতে, সন্ধ্যাকালে বা মধ্যাহ্নে অথবা যে কোন সময় যদি মনুষ্য অনুতপ্ত হৃদয়ে নারায়ণকে

স্মরণ করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব বুঝা গেল যে সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ ও অনুতাপ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার ক্রিয়মান কর্ম্মেরও ফলোৎপত্তি হইবে না তাহাও শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন, যথা—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ।৩১

অর্থাৎ আমি দাস, প্রভুর ইচ্ছায় আমি কর্ম্ম করি এই ভাবে ভগবানকে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম নির্ম্মম চিত্তে ও শোক পরিহার করিয়া কর্ম্ম কর। যাঁহারা অসূয়া বিহীন ও শ্রদ্ধাবান হইয়া এই ভাবে কর্ম্ম করেন তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হন্। অতএব ঐ মত ভাবে কর্ম্ম করিলে "ক্রিয়মান" কর্ম্মের আর ফলোৎপত্তি হইবে না এবং কর্ম্মের ফলোৎপত্তি না হইলে আর জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মায়াই জগৎ উৎপত্তির কারণ। মায়া অনাদি, ইহার উৎপত্তি নাই। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে পরমাত্মার শক্তিরূপ মায়া ছিল। ঐ শক্তি

পরব্রহ্মের সত্ত্বা হইতে পৃথক নহে। তথাপি মায়াশক্তিকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কার্য্যের দ্বারাই বস্তুর শক্তি প্রতীয়মান হইয়া থাকে নতুবা বস্তুতে তাহা লক্ষিত হয় না। যেমন বীজের মধ্যে অঙ্কুর-উৎপাদিকা শক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা মৃত্তিকাতে প্রোথিত না হইলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। জগৎ বস্তুবিশেষ, কার্য্যদ্বারা পরমাত্মশক্তি **মায়া** অনুভূতা হন্। তাহা বলিয়া মায়া ও জগৎ পৃথক ধারণা করা বিধেয় নহে। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি। অগ্নির আশ্রয় অঙ্গার, অঙ্গারের দাহিকাশক্তি পৃথকরূপে অনুভূত হয় কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ই এক। তেমনি জগৎ ও মায়া উভয়ই এক, জগৎ পরব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি, মায়া তাঁহার শক্তি। **আশ্রয়** ও **কার্য্য** উভয় হইতে **শক্তিকে** ভেদাভেদ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়া শক্তিকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপত্তি। ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে "ঘটোৎপাদিকা শক্তি" মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া থাকে। অনির্ব্বচনীয় বলিবার আরও কারণ যেহেতু মায়া সৎ কি অসৎ, মায়ার স্বরূপ কি ইহা নির্ণয় করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

(জ্ঞানতত্ত্ব ও ইন্দ্রিয় সংযম)

জগৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে জীবতত্ত্ব ও ভূতাদি ও ইন্দ্রিয়াদির অনুশীলনের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে এই জগৎ কল্পনামূলক ও বিনাশশীল এবং ইহার কার্য্যও তদ্রূপ। অতএব ইহা অনাদি অনন্ত উৎপত্তিহীন অবিনাশী চৈতন্য হইতে পৃথক। মায়াকল্পিত অনিত্য বস্তুকে আত্মজ্ঞান করা মূঢ়তা মাত্র। তবে যদ্যপি সকলি মিথ্যা হইল কি নিয়া সংসারে থাকিব? জীবন লাভেরই বা উদ্দেশ্য কি? তুমি নিত্যবস্তুকে অবলম্বন কর। নিত্যবস্তু লাভের জন্য কর্ম্ম কর। জীবনধারণের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ করা। মোক্ষলাভ করিতে পারিলে আর সংসারে আসিয়া শোক দুঃখাদির তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে না। নিত্য বস্তু লাভ করিতে হইলে ও দুঃখময় সংসারের যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ কবিতে হইলে যেমন কর্ম্মের আবশ্যক তেমনি উপাসনা ও সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য উপাসনা সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন, যথা—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥

এবং হি শরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনা দেব ন করোতি হিতং নৃষু॥

অর্থাৎ গাভীগণের শরীরে ঘৃত দুগ্ধের অন্তর্গত থাকিলেও তাহাতে তাহাদের শরীরের গ্লানি দূর হইয়া পুষ্টিসাধন করে না। কিন্তু ঐ দুগ্ধ মন্থনাদি ক্রিয়া দ্বারা ঘৃতরূপে পরিণত হইলে সেই ঘৃতই আবার গাভীগণের ক্ষতাদির ঔষধের স্বরূপ হিতসাধন করে। তদ্রূপ জানিবে পরমেশ্বর ঘৃতবৎ আমাদের সকলের শরীরে অবস্থিত আছেন কিন্তু বিনা উপাসনায় আমাদের কল্যাণ সাধন করেন না। উপাসনা মন্থনের স্বরূপ। উপাসনা ব্যতিরেকে আমাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে জানিতে পারি না। অতএব উপাসনা আমাদের নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অবগত হও।

কর্ম্ম হিত ও অহিত উভয়বিধ ফলের উৎপাদক। যেমন অগ্নি আমাদের পরম হিতকারক তেমনি উহাই আবার পরম অপকারক। অগ্নিকে সংরক্ষণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ও উহার সাহায্যে বাষ্পীয় যানাদির গতিশক্তি উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা আমাদের কত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। আবার সেই অগ্নির অসংরক্ষণের ফলে সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। তদ্রূপ সংরক্ষণ

অর্থাৎ সংযমাদির দ্বারা আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করে। আর অসংরক্ষিত অর্থাৎ অসংযমিত কর্ম্ম আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। অতএব কর্ম্মই আমাদের শুভাশুভ ফলোৎপত্তির একমাত্র উপায় বলিয়া অবগত হইবে।

আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রবিশেষ। উহাদের আশ্রয় দেহ। ইন্দ্রিয়গণের ভোগোৎপত্তিতে সুখ দুঃখ অনুভব হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজক এবং বুদ্ধি তাহাদের চালক অর্থাৎ মনের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োগ করে। অতএব দুষ্কর্ম্মের জন্য ইন্দ্রিয়গণ দায়ী নহে। সৎ অসৎ কর্ম্মের ভেদদ্যোতক জ্ঞানের দ্বারা যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে নিয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের বৃত্তি সঙ্কল্পাত্মিকা অর্থাৎ ভাবের উৎপাদিকা। এই ভাবই বাসনা। বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। আবার কর্ম্ম হইতে পুনর্বাসনার সৃজন। এইরূপে বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ। বাসনা এবং কর্ম্মসূত্রে জীবসকল আবদ্ধ হইয়া জন্মমরণরূপ সংসারমার্গে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে।

এক অন্তঃকরণ হইতে বৃত্তিভেদে "মনের" উৎপত্তি হইয়াছে। অন্তঃকরণ কেন্দ্রস্থান। এই অন্তঃকরণ হইতে

চারি প্রকার বৃত্তি অনুসারে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। মন হইতে যখন ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে তখন মন শুদ্ধ হইলে মনের ভাবও শুদ্ধ হইবে, আর মন যদি অশুদ্ধ হয়, মনের ভাবও অশুদ্ধ হইবে। অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে মন শুদ্ধ হয় তাহা জানিতে হইবে। মনশুদ্ধির উপায় প্রথম **সাধনা,** দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা **সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান**।

সাধনা কি তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে। সাধনা চারি প্রকার যথা—

১ম। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক।

২য়। ফলভোগ বিরাগ।

৩য়। শমাদি ষটক্ সম্পত্তি যথা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

৪র্থ। মুমুক্ষুত্ব।

এই সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যথা—

১। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই নিশ্চয়জ্ঞানকে "নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক" বলে।

২। দেহাদি অনিত্য, ভোগ্যবস্তু সমূহে অনিচ্ছা ও তাহাদের দোষ দর্শন করাকে "ফলভোগ বিরাগ" বলে।

৩। শমাদি ষটক্।

(ক) সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগের নাম "শম"।

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্তি করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত রাখার নাম **দম**।

(গ) বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্তি করিয়া নিশ্চল ভাবে রাখাকে **উপরতি** বলে।

(ঘ) চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করাকে **তিতিক্ষা** বলে।

(ঙ) শাস্ত্র বাক্যে ও গুরুবাক্যে যে বিশ্বাস সেই জ্ঞানকে **শ্রদ্ধা** বলে।

(চ) লক্ষ্যবস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাকে **সমাধান** বলে।

৪। অজ্ঞানকল্পিত সংসাররূপ বন্ধন হইতে স্ব-স্বরূপ বোধের দ্বারা কিরূপে আমি মুক্ত হইব এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছাকে **মুমুক্ষুত্ব** বলে।

মনকে সাধনমার্গে আনিয়া উপরোক্ত ভাবে চালনা করিতে পারিলে মন হইতে বিশুদ্ধভাবের স্ফুরণ হইবে এবং কর্ম্মসাধক ইন্দ্রিয়গণকে মন বিশুদ্ধ ভাবের কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর করিবে। আর যদি মনকে অসংযত ও বিশৃঙ্খল ভাবে চালিত কর মনের বাসনাও মলিন তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়াসাধনের নিমিত্ত অনুক্ষণ

ব্যস্ত থাকিবে। অনিত্য বস্তুকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া জড়ে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যতই কেন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, অনিত্যের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে, পরমাত্মার সন্ধান করিতে পারিবে না।

তত্ত্ববিদ্ পুরুষ সাধনা চতুষ্টয়ের আশ্রয় লইয়া কার্য্য করেন। তাঁহারা বাহ্য লোক দৃষ্টিতে শরীরধারী হইয়াও নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে স্থিতিলাভ করেন এবং কোন কিছুতে অনুরক্ত না হইয়া পূর্ণ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও পরম শান্তিতে কাল যাপন করিতে থাকেন। ভগবানের কৃপা না হইলে হৃদয়ে বল, শান্তি ও প্রসন্নতা জন্মায় না। কৃপা হয় কাহার প্রতি? যিনি অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত, অনুগত, ও সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিজেকে তাঁহার দাস মনে করিয়া কর্ম্ম করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জীবসকল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারগুলির মধ্যে যেগুলি ফলোন্মুখী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই ফলভোগের নিমিত্ত স্থূল শরীর লাভ করে। অতএব স্থূল শরীর লাভ করিয়া যে সকল পার্থিব বস্তু ও যশোপার্জ্জন ইত্যাদি ভোগ করা যায় তাহা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দান নহে। ইহজন্মে যাহা লাভ করা যায় তাহা বুঝিতে হইবে জন্মান্তরীন সঞ্চিত কর্ম্মফল। ঈশ্বর

আমাদিগকে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পরোক্ষে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি বলেন "স্বাধীন হইয়া আমি প্রকৃতিঅধীন, জগৎপালক বটে, তবু উদাসীন"। আবার বলেন—

দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি তেজস্তেজস্বিনাম্ অহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতাম্ অহম্॥
শ্রীগীতা ১০।৩৬।

অর্থাৎ বঞ্চকগণের দ্যূত স্বরূপ আমিই, উদ্যোগী পুরুষের উদ্যম আমিই, তেজস্বী পুরুষের তেজ আমিই, বিজয়ীর জয় আমিই, এবং সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ আমিই।

ইহা হইতে বুঝা যায় পুরুষাকার স্বরূপে ঈশ্বর আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে সহায়তা করেন কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্মে তিনি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। তবে ঈশ্বরের কৃপা কোথায়? তাঁহার কৃপা আমাদের হৃদয়ে। জ্ঞানরূপে তিনি আপনার স্বরূপ আপনি প্রকাশ করেন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ জ্ঞানোদয় হয় তখনি সর্ব্বপ্রকার ভয়, ভাবনা, সুখ, দুঃখ দূর হইয়া যায়। শ্রীগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তখন মানব সদানন্দরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরব্রহ্মে সর্ব্বক্ষণ স্থিতিলাভ করতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। বুঝিতে হইবে

যে পার্থিব বস্তু ও মানসম্মান যাহা লাভ বা অলাভ করা যায় তাহা আমাদের পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল মাত্র। অঘটন ঘটন কর্ম্মের দ্বারা ইহার উৎপত্তি ও ভোগ আপনা হইতেই হইয়া থাকে এবং ইহা অনিবার্য্য। **আর হৃদয়ের বিমল শান্তি ও প্রসন্নতা লাভ পরমেশ্বরের দান বলিয়া জানিও।** সকল প্রকার বস্তু পুরুষাকার দ্বারা অর্জ্জন করা যায় কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত সদানন্দ লাভ কিছুতেই করা যায় না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সংসারের আর্ত্তনাদ ও কোলাহলপূর্ণ স্থানে বাস করিয়াও তাঁহার মনকে একমাত্র চৈতন্যময় পরব্রহ্মে নিযুক্ত রাখিয়া ঔদাসিন্যভাবে সংসারের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। নর্ত্তকী যেমন মস্তকোপরি কলসের উপর কলস দিয়া পাঁচ সাতটি কলস সমেত অঙ্গভঙ্গির দ্বারা নৃত্য করিয়া থাকে, দর্শকবৃন্দের করতালি বা ধন্যবাদের দিকে মনকে আদৌ যাইতে দেয় না, একমাত্র কলসগুলিতেই মনকে নিযুক্ত রাখে, তদ্রূপ তত্ত্ববিদ্ সাধুপুরুষ সাংসারিক নানাপ্রকার কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি সে সকলে অনাসক্ত ও নিন্দা বা প্রশংসাতে অবিচলিত হইয়া নিরন্তর চৈতন্যময় ব্রহ্মে তাঁহার মনকে সংযুক্ত রাখেন। ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান

করিতে পারিলে মনের মলিনতা দূর হয় এবং বিশুদ্ধ মনে শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবের উদয় হয়।

পূর্ব্ব জন্মান্তরিণ কর্ম্মফলের দরুণ মন পাপপূর্ণ হইয়া থাকে। তজ্জন্য মনে ভয়, উদ্বেগ, শোক, দুঃখ, মরণ ইত্যাদি ভাব উদয় হয়। সেই পাপক্ষয় করিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক। মনের মধ্যে যে সকল ভাবের লয়, বিক্ষেপ, রাগ, দ্বেষ, শোক, দুঃখ ইত্যাদি উৎপন্ন হয় তৎসমুদায়ই পাপ হইতে সঞ্জাত। নিত্যকর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সর্ব্বকর্ম্মে ভগবৎস্মরণ, সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা অভ্যাসের মধ্যে আনিতে পারিলে ঐ সকল পাপ ক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়।

"যজ্ঞ" বলিলে সাধারণতঃ অগ্নিসংস্কারের দ্বারা নিঃস্বার্থ-ভাবে সর্ব্ব জীবের সেবার নিমিত্ত আত্মসমর্পণরূপ বৈদিক ক্রিয়াকে বুঝায়। বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রায় লোপ পাইয়াছে। যজ্ঞের মধ্যে **জপযজ্ঞ** প্রধান এবং সহজ সাধ্য। সর্ব্বদা ভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করাকে **জপযজ্ঞ** বলে এবং ঐপ্রকার জপের দ্বারা মনের বিশুদ্ধতা জন্মে।

দান কলিযুগের মনশুদ্ধির একটি প্রধান উপায়। দানে অভিমান শূন্যতা এবং তাহা ঈশ্বর প্রীতির জন্য করা

হইতেছে এই বিশুদ্ধভাবের যে দান তাহাতে মন শুদ্ধ হইয়া থাকে। দানের বিনিময়ে কোন প্রকার আশু বা ভাবী ফল প্রত্যাশা থাকিলে তাহাকে প্রকৃত **দান** বলা যায় না।

তপস্যা বলিলে আমরা সচরাচর মনে করি সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা কোন প্রান্তর নির্জ্জন দেশে গিয়া উপাসনা না করিলে হয় না, কিন্তু **সংসারে থাকিয়াও তপস্যা হয়।** দেখা যায় প্রাচীন ঋষিগণ সংসার আশ্রমের মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সংসার বৈরাগ্য ছিল না। তপস্যা তিন প্রকারে করা যায়, যেমন শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা।

শরীরের দ্বারা তপস্যা—যেমন দেব, গুরু, দ্বিজ প্রভৃতিকে প্রণাম, হস্তপদাদির দ্বারা কাহাকেও পীড়া না দেওয়া, সাধুসেবা, দেবার্চ্চনা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বাক্যের দ্বারা তপস্যা—যেমন বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, মনোহর স্তোত্র পাঠ করা, উদ্বেগযুক্ত বাক্য প্রয়োগ না করা, সত্য কথা বলা, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

মনের দ্বারা তপস্যা—যেমন জপে মনকে

সর্ব্বদা একাগ্র করা, হিতকর বিষয়ের চিন্তা করা, সর্ব্বকর্ম্মে ভগবদ্-স্মরণ, জীবে দয়া ইত্যাদি।

মনের মধ্যে ভাবের লয় ও বিক্ষেপ হয়। লয় অর্থে নিদ্রা ও আলস্য এবং বিক্ষেপ অর্থে পুনঃ পুনঃ বিষয়ের অনুসন্ধানকে বুঝায়।

মনের সংযম করিতে না পারিলে মন শুদ্ধ হয় না। **মনের ধর্ম্ম** সঙ্কল্পাত্মিকা, অর্থাৎ ভাবের নিত্য উৎ-পাদক। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে নিরন্তর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কারণ মন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাশ্রিত। মনকে কোন বিষয়ে একাগ্র করিতে গেলে ঐ গুণত্রয় সঞ্জাত চিন্তাতরঙ্গ মনকে আন্দোলিত করে। অবশেষে নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, জৃম্ভণ প্রভৃতি আসিয়া শরীরে আশ্রয় লইয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। অতএব মনশুদ্ধির উপায় মনঃসংযম এবং মনঃ-সংযমের উপায় প্রাণায়াম সাধন। প্রাণায়ামের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে।

বিষয় শব্দে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শকে বুঝায়। বিষয়ের সহিত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিয়োগ এবং ঈশ্বরের সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের যোগ দ্বারা মনের শুদ্ধতা জন্মে। অন্তরিন্দ্রিয় বলিলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে বুঝায়।

আবার নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য

হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া মনকে ঈশ্বর পরায়ণ করিতে পারিলে মনের শুদ্ধতা জন্মাইয়া থাকে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরমাত্মজ্ঞান—তাহা লাভের উপায় **কর্ম্ম**। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রধান বাক্, পাণি ও পাদকে জানিবে। ইহাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শুভ বিষয়ে নিযুক্ত করিতে পারিলে মন শুদ্ধ হয়। স্তোত্র পাঠ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ, পুষ্পচয়ণ, চন্দন ঘর্ষণ, দেব দর্শন, তীর্থপর্য্যটন, ইত্যাদিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের উপভোগ্য বিষয় মনে করিয়া উহাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলে মনের প্রসন্নতা জন্মে।

সৎসঙ্গ ও সৎ উপদেশ বাক্য শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে।

বেদান্ত শাস্ত্র গুরুমুখে, উপদেষ্টা বা সাধুকর্ত্তৃক পঠিত হইলে তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত উপদেশ বাক্য যাহা শুনা যায় তাহাকে **শ্রবণ** বলে।

যাহা শ্রবণ করা যায় তাহা যুক্তির দ্বারা সর্ব্বদা চিন্তা করাকে **মনন** বলে।

যুক্তির সহিত অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে **নিদিধ্যাসন** কহে।

ইহা ব্যতীত মনশুদ্ধির আরও একটি উপায় নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি, নির্ম্মল ও মনোহর দৃশ্য দর্শন, সুললিত ও মধুর স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ, সুমিষ্ট আঘ্রাণ, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চাত্যাগ, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সাত্ত্বিক আহার।

আহার ত্রিবিধ—যথা সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্ব, তম ও রজোগুণ বিশিষ্ট মানব তাহাদের গুণধর্ম্ম প্রাধান্যে যে যে প্রকার আহারে আনন্দ ও প্রীতি জন্মে তিনি শ্রীগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ৮।৯।১০ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্বকৃত শ্রীগীতার টীকায় কোন্ বস্তু আহারে কি ফল হয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিবেন। মোট কথায় বুঝিতে হইবে, যে আহারে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির উদয় হয় এবং প্রীতিবর্দ্ধক তাহাকে সাত্ত্বিক আহার বলে। যে খাদ্য ভোজনকালে পীড়াদায়ক যেমন কটুতিক্ত ইত্যাদি ও ভোজনের পরেও মন অপ্রসন্ন থাকে তাহাকে রাজস আহার বলে। আর অর্দ্ধপক্ক কি অপক্ক, দুর্গন্ধপূর্ণ ও বাসি খাদ্যকে তামস আহার বলে। মানুষের সত্ত্ব রজঃ তম গুণানুসারে বিভিন্ন প্রকার আহারে রুচি জন্মাইয়া থাকে। আহারের মধ্যে আবার কোন্ আহার্য্য

বার অনুসারে গ্রহণ করিলে তাহার কি ফল হয় শাস্ত্রমুনি তৎসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন যথা---

আমিষ্যং মধুপানঞ্চ যঃ করোতি রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা ॥ ১ ॥
স্ত্রী-তৈল-মধু মাংসানি যস্ত্যজেত্তু রবের্দিনে।
ন ব্যাধিঃ শোক-দারিদ্র্যং সূর্য্যলোকং সগচ্ছতি ॥২॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রবিবারে মৎস্য, মাংস ও মদ্য পান করে সেই মানব সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত রোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপরেও প্রতিজন্মে দরিদ্রতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। ১ ॥

যে ব্যক্তি রবিবারে স্ত্রী, তৈল, মদ্য ও মাংস সম্ভোগ না করে, তাহার ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতা হয় না এবং মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি সূর্য্যলোকে গমন করে ॥ ২ ॥

অতএব আহারের দোষঘটিত আমরা যে মহাকষ্ট পাইয়া থাকি তাহার সন্দেহ নাই এবং বিচার করিয়া আহার করিলে অন্তরে উৎসাহ, সামর্থ্য, সাত্ত্বিকী জ্ঞান, আনন্দ ও প্রীতি জন্মে।

উপাসনা, ধ্যান ও ধারণা এ সকলকেও মনশুদ্ধির উপায় জানিবে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মনোহর স্তোত্রের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনার নাম **উপাসনা**। বেদ ঐ উপাসনার

প্রবর্ত্তক। ঋক্, যজুঃ ও সাম :এই বেদত্রয় হইতে ব্রহ্মা সারবাক্য ওঁ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তিন বেদের মধ্য হইতে "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি সাবিত্রী মন্ত্রের এক একটি পাদ ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গায়ত্রীমন্ত্র মানবের প্রধান নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা। ওঙ্কার রহস্য ও ত্রিপদী গায়ত্রী পরে আলোচিত হইবে।

ধ্যান কাহাকে বলে? "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ" অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় মনের বিষয় স্বরূপ কোন জ্ঞান থাকে না তাহার নাম **ধ্যান**। ধ্যান শব্দে পরমানন্দ প্রদায়িনী চিন্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ধারণা কি? মনের গতি সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়া থাকে। মন যেখানেই যাউক না কেন সেই স্থানেই ব্রহ্ম চিন্তন দ্বারা মনকে স্থির করিয়া রাখার নাম **ধারণা**।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের স্থিরতা ও বিশুদ্ধতা জন্মান নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধনের উপায় প্রাণায়াম জপ। প্রাণায়াম সাধন সম্বন্ধে নিম্নে বিবৃত হইল যথা—

বায়ুর গমনাগমন ও উহাকে ধারণ করাকে যোগীগণ প্রাণায়াম কহিয়া থাকেন। মনোবৃত্তি সমূহের উদয় একমাত্র প্রাণ স্পন্দনের অধীন। তজ্জন্য প্রাণায়ামের দ্বারা চলিত প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিলে মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ

হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের প্রভু মন। কারণ মনঃ-সংযোগ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না। মন শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণবায়ুর অধীন। অতএব শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ না হইলে মনের স্থিরতা হয় না। যেমন দীপশিখা বায়ু কর্ত্তৃক চঞ্চল হইয়া থাকে—তেমনি মনরূপ দীপ প্রাণরূপবায়ুর দ্বারা সর্ব্বদা চঞ্চল। এই বায়ুরোধ করিতে পারিলে দীপশিখার ন্যায় মনও স্থির ভাবাপন্ন হইবে। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ু বশীভূত হইলে মন লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

পবনো বধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে।
মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনস্তেন বধ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি প্রাণ বায়ুকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনি মনকেও বদ্ধ করিয়াছেন। আর যিনি মনকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি প্রাণকেও বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। প্রাণ ও মন এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বদ্ধ করিতে পারিলেই অপরটিও বদ্ধ হইয়া থাকে। মন ও প্রাণ উভয়েই সংজড়িত। একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। প্রাণায়ামের দ্বারা মন ও প্রাণকে লয় বা স্থির করিলে সেই লয় একমাত্র অনাহত ধ্বনিরূপ নাদের আশ্রিতি বা অভ্যন্তরে অবস্থিতি লাভ

করে। নাদের সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। এতৎ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, যথা—

অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয়মাগতে।
মনঃ প্রশমমায়াতি নির্ব্বাণম্ বশিষ্যতঃ॥

অর্থাৎ প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা প্রাণক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ স্থিরতালাভ করিলে মনও প্রশমিত হয়, আর তাহাতেই নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলে ইহ সংসারের জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া জীবকে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

প্রাণায়াম বিধি যথা—পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশ হইতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদরে তাহা পূরণ করাকে **পূরক** বলে। ঐ পূরককে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করাকে **কুম্ভক** বলে, এবং ঐ উদরস্থ বায়ুকে বহির্দ্দেশে ত্যাগ করাকে **রেচক** বলে।

বেদান্তসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

রেচক-পূরক-কুম্ভক-লক্ষণাঃ।
প্রাণ নিগ্রহোপায়াঃ—প্রাণায়ামঃ।

দক্ষিণ নাসিকা বদ্ধ করিয়া বাম নাসিকাতে অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে, তাহার পর দক্ষিণ ও বাম নাসিকা

উভয়কে বদ্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে, তদনন্তর বাম নাসিকা ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে ; ইহাকে একটি পূর্ণ প্রাণায়াম বলে।

ইহার ক্রম বা সংখ্যা যথা—পূরণে ৪ বার, ধারণে ১৬ বার, রেচকে ৮ বার এবং সাধ্যানুসারে প্রত্যেক সংখ্যার চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করা যায়, যেমন ৪×৪=১৬, ১৬×৪=৬৪, ৮×৪=৩২ ইত্যাদি। যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন তাহাব মূল মন্ত্র অথবা একাক্ষর **ওঙ্কার** জপ ঐরূপ নিয়মে করিলে জপের ফলপ্রাপ্তি লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। ওঙ্কার রহস্য পরে আলোচিত হইবে।

যে যে অঙ্গুলিদ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয় ত্রিপুবসার তন্ত্রে উক্ত আছে যথা :—

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্টৈনাসাপুট বিধারণম্।
প্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতী তর্জ্জনী-মধ্যমা বিনা॥

অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসা রোধ করিতে হইবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমা আল্গা রাখিবে, উহাদের দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে না।

সংযমাদিব দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে

তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। **যোগ** কি বুঝিতে হইবে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার লয় অর্থাৎ একতাভাবকে যোগ বলে। এই একতাভাব আনিতে গেলে বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তি হইতে সরাইয়া লইয়া মনেতে লীন করিতে হইবে। এব্যাপারটি সহজে সম্পন্ন হয় না, ইহাই ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ অনুভূতি হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক বলশালী। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় দর্পণের ন্যায় বা ফটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায়; বাহ্য বিষয় ইহাদের সান্নিধ্যে আসিবা মাত্র মনলগ্ন ইন্দ্রিয়গণ তৎক্ষণাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে তাহাদের আকারে আকারিত হইয়া পড়ে। বাহ্য বিষয় রূপরসাদির মধ্যে **শব্দই** যোগসাধনের প্রধান অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্ন উৎপাদন করে। প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে অন্যান্য বিষয় হইতে স্থির করা যায়, কিন্তু শব্দকে রোধ করা যায় না। তজ্জন্য যোগীগণ শব্দকেও রোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধক দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণবিবর চাপিয়া ধরিবেন, তাহাতে অনাহত ধ্বনি উঠিবে, সেই শব্দ শুনিয়া চিত্ত স্থির করিবেন। ইহাও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে

প্রাণায়ামকালে বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন সময়ে সমুদ্র, মেঘ, ভেরী ইত্যাদি শব্দ তুলিবে, তাহাহইলে মন তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া স্থিতি লাভ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরম শান্ত তুরীয় নাদ পদ প্রাপ্ত না হওয়া যায় অর্থাৎ চিৎ অভিব্যঞ্জক নাদ অনুভব না হয় ততক্ষণ এইরূপ করিতে থাকিবেন। ইহাকে নাদানু-সন্ধান কহে। নাদানুসন্ধানে বায়ু স্থির হইবে এবং অণিমাদি সিদ্ধ আসিবে। নাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে শব্দ আর শ্রবণে আসিবে না। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা অর্দ্ধ মাসের মধ্যে সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্য নিবারিত হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু স্থিতি লাভ করিলে যোগী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি শুনিতে থাকিবেন এবং তাহাতে চিত্ত সমাসক্ত হইয়া স্থির ভাবাপন্ন হইবে অর্থাৎ মনলয় প্রাপ্ত হইবে। মধুপান করিতে থাকা অবস্থায় ভ্রমর যেমন আর গন্ধের অনুসন্ধান করে না, সে মধুপানেই মগ্ন হইয়া পড়ে তেমনি নাদাকৃষ্ট যোগীর নাদেই মন সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে অন্য কোনদিকে আর আকৃষ্ট হইতে পারে না। মন উন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা রূপ রসাদি বিষয়ভোগে মত্ত। সেই মত্ত গজেন্দ্রের অঙ্কুশ স্বরূপ হইতেছে নাদ। এই নাদরূপ অঙ্কুশের দ্বারা মনরূপ গজেন্দ্রের বিষয় গ্রহণ ও প্রত্যাহাররূপ চপলতার দমন

হইয়া থাকে। পক্ষীর পক্ষ ছিন্ন করিয়া দিলে সে পক্ষী যেমন আর উড়িতে পারে না সেইরূপ মন নাদাহত হইলে আর তাহার চপলতা থাকে না। নাদ আপন শক্তির দ্বারা মনের চাঞ্চল্য হরণ করিতে সমর্থ। এই নাদ সম্বন্ধে আরো অনেক জানিবার ও চিন্তা করিবার আছে যাহা গুরুমুখে জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

স্তোত্র, জপ, ধ্যান ও নাদের সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল তৎসম্বন্ধে কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে, যথা—

পূজা কোটি সমং স্তোত্রং স্তোত্র কোটিসমো জপঃ।
জপকোটি সমং ধ্যানং ধ্যান কোটিসমো লয়ঃ ॥
নহিনাদাৎ পরোমন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মানঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরাপূজা নহি তৃপ্তেঃ পরম ফলম্ ॥

অর্থাৎ

স্তব পাঠ করিলে কোটি পূজার সমান ফল হয়। জপ করিলে কোটি স্তোত্র পাঠের সমান ফল হয়। ধ্যান কোটি জপের সমান ফল দান করে। আর মনোলয় হইতে কোটি ধ্যানের ফল হয়। নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই। নিজের আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নাই। নাদের অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ পূজা। তৃপ্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল আর নাই।

উ "তৈজস" শব্দে—একটি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট পদার্থকে বুঝায়।

ম "প্রাজ্ঞ" শব্দে—একটি অজ্ঞান শরীর বিশিষ্ট পদার্থকে বুঝায়। অজ্ঞান শব্দে "কারণ" বুঝায়। অতএব এক ওঁ বাক্যের দ্বারা পূর্ণ চৈতন্যময় পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করা যায়। অবান্তরে পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ওঁকারের আদিম অর্থ বেদোক্ত বচনের দ্বারা একটি "অস্তিত্ব ভাবের" প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মনুষ্যের মৃত্যু দেখিয়া লোকে যে তর্ক বিতর্ক করে, জিজ্ঞাসা করে,—পরলোক আছে কি নাই ? তদুত্তরে নাস্তিক বলেন—"ন"-পরলোক নাই, আর আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলেন "ওঁং"-হাঁ, আছেন বটে। অবশেষে ঋষিগণ ওঁ এই শব্দ রূপনামবিবর্জ্জিত সত্তামাত্রজ্ঞেয় পরমাত্মার উৎকৃষ্ট নাম বলিয়া বিধান করিয়াছেন। (বেদ প্রবেশিকা মধুছন্দার সোমযাগ, ২য় অধ্যায়, ৭৮ পৃষ্ঠা)

শরীর ত্রিবিধ যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। শরীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ওঙ্কারের অপর একটি নাম প্রণব। প্রণব ব্রহ্ম স্তুতি বাক্যে অর্থাৎ উক্ত বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের আরাধনা

করা হয়। এই ব্রাহ্মণ বেদোচ্চারণের আরম্ভে ও শেষে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের উচ্চারণ করিবেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যথা—

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদ্ আদাবন্তে চ সর্ব্বদা"

ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতার ৮ম অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২
ওম্ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩

অর্থাৎ সর্ব্বদ্বার বন্ধ করিয়া ও মনকে হৃদয়ে সর্ব্বতো-ভাবে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে ভ্রূমধ্যে ধারণ করিয়া আত্ম-সমাধিরূপ যোগে নিযুক্ত থাকিয়া ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পরমাগতি লাভ হয় অর্থাৎ তাঁহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না। সর্ব্বদ্বার অর্থে বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্মাইয়া থাকে যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌কে বুঝায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে এক ওঁ বাক্য সাধনা ও

জপের দ্বারা দেহী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সনাতন বেদ যে গায়ত্রী মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মোপাসনা। এই গায়ত্রীমন্ত্র জপের দ্বারা পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। এরূপ নির্গুণ, নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা আর আছে কি না সন্দেহ। এক গায়ত্রী জপ দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায়। দুঃখের বিষয় অনেকেই ইহার অর্থবোধ করিতে না পারায় ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। অনেকে ইহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি যে ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করুন, মূলে গায়ত্রীমন্ত্র সেই এক। যিনি যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়া ইহা ধ্যান করেন এবং যাহাতে তাঁহার চিত্তস্থির হয় এবং পরমানন্দ লাভ করেন তাঁহার পক্ষে সেই ভাবই শ্রেয়ঃ। আমি আপন হৃদয়ে গায়ত্রী অর্থ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিলাম।

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইলে তাঁহাকে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়। সাবিত্রী মন্ত্রই গায়ত্রী। অতএব গায়ত্রীর অর্থ বোধ না হইলে সে ব্রাহ্মণ পতিত এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করিয়া যে ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করেন তিনি মনুষ্যের মধ্যে

অধম। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ মাত্রেরই গায়ত্রীর অর্থ সম্যক্‌ রূপে অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

গায়ত্রী মন্ত্রঃ যথা—

ওঁ ভূ ভূর্ব স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ ॥

অন্বয়।—সবিতুঃ দেবস্য যো ভর্গঃ নঃ ধিয়ো প্রচোদয়াৎ

(তৎ ভর্গং অহং) ধীমহি।
তৎভর্গং কিম্ভূতং? বরেণ্যং।
পুনঃ কিম্ভুতং? ভুভুর্বঃ-স্বঃ।

অর্থ। সবিতুঃ (জগৎ প্রসবিতুঃ বা সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য), দেবস্য (দীপ্তিক্রীড়াদি গুণযুক্তস্য), যো ভর্গঃ (যো বরণীয় তেজঃ), নঃ (অস্মাকং); ধিয়ো (স্বকীয়াঃ বা স্বতঃ সমুৎপন্নাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মদ্যোতকং বুদ্ধীঃ), প্রচোদয়াৎ (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষেষু নিয়োজয়তি), তৎ ভর্গং (স্বয়ং জ্যোতিঃ), অহং (সোঽহমস্মি ইত্যভেদেন), ধীমহি (বয়ং ধ্যায়ামঃ)।

তৎ ভর্গং কিম্ভূতং? বরেণ্যং (বরণীয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বা অর্থাৎ জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশায় ধ্যানেন উপাসনীয়ং)।

পুনঃ কিম্ভূতং ? ভূ-ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূ ভুবঃ স্বঃ লোকোপি যৎ ভর্গাৎ উৎপদ্যন্তে, বর্ত্তন্তে, ম্রিয়ন্তে বা এবম্ভূতং ঈশ্বরং অহং (সোঽহমস্মি ইত্যভেদেন চিন্তয়ামঃ)।

বঙ্গানুবাদ। জগৎ প্রসবকর্ত্তার যে বরণীয় তেজ আমাদের স্বকীয়া অর্থাৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয় এমন বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেতে নিয়োগ করেন সেই স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ অন্তর্যামি পরমপুরুষকে তিনিই আমি এই বলিয়া ধ্যান করি।

তিনি কি প্রকার? জন্ম মৃত্যু দুঃখাদিরূপ যে ভয় তাহা বিনাশের নিমিত্ত উপাসনার যোগ্য। আর কি প্রকার? যাঁহার আপনার আপনি স্পন্দনে এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও রসাতল উৎপন্ন, বর্ত্তমান ও প্রলয় সাধন হইতেছে এমন যে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর তিনিই আমি এই চিন্তার দ্বারা ধ্যান করি।

কেহ কেহ গায়ত্রীমন্ত্রকে নির্গুণ উপাসনা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন কারণ তাঁহারা ভূ-ভূব-স্বঃ এই ত্রিপদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা ত্রিগুণাত্মক ও নামরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। চিত্তের স্থিরতা লাভের জন্য যে ইহা কল্পিত হয় তৎসম্বন্ধে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। নিরাকার পরব্রহ্মকে ধারণা করিতে হইলে অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে অতীব

কঠিন। এইজন্য আহ্নিকতত্ত্বে গায়ত্রীর ধ্যানে শাস্ত্রকারগণ ত্রিমূর্ত্তির চিন্তা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতাথায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥

সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ভাবিয়া দেখিলে গায়ত্রীধ্যান অর্থে নির্গুণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বরণীয় জ্যোতিঃকে অর্থাৎ ব্রহ্মাত্ম চিন্তাকে যেমন "আপনি আপনার" উপাসনাকে বুঝায়। নাম ও রূপ ত্যাগ করিলে বাহ্য জগতে দৃশ্যমান আর কিছুই থাকে না, কেবল মাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দই বর্ত্তমান থাকেন। বহির্মুখী চৈতন্য দৃশ্য পদার্থের অভাবে অন্তর্মুখী হয়েন এবং চৈতন্য অন্তর্মুখী হইলেই আপনাকে আপনি অর্থাৎ আপনার স্বরূপ দেখিতে পান। স্বরূপ দর্শন লাভ হইলেই "ব্রহ্মৈবাস্মি" আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভেদ তাহা স্থির নিশ্চয় হইয়া থাকে। গায়ত্রী ধ্যান সর্ব্বজাতির ও সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণকর উপাসনা, ইহা একদেশীয় বা কোন সাম্প্রদায়িক উপাসনা বলিয়া গণ্য করিলে ইহাকে খর্ব্ব করা হয়। ইহার নির্গুণতা সম্বন্ধে শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা ধৃত বচন যথা—

যজ্জীব ব্রহ্মণোরৈক্যং সোঽহমস্মীতি বেদনম্ ।
তদেব নির্গুণ ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৮

অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে সোঽহমস্মি অর্থাৎ তিনিই আমি এইরূপ অভেদ ভাবে যে স্থিতি তাহাকেই ব্রহ্মবেত্তা মহাত্মাগণ নির্গুণ ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও সেই পোষকে বলিতেছেন—

ব্রহ্ম ব্রহ্ম ময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেনং ভবেৎ ।
তদেব নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৮

অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদরূপ চিন্তার নাম ধ্যান। ধ্যেয় বস্তুতে যাঁহার মন আসক্ত, ধ্যেয় বস্তুই কেবল চিন্তা করেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই জানেন না তাহাই নির্গুণ ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আত্মা নির্গুণ ও নিরাকার। আত্মার ধ্যান অর্থে নিরাকার ও নির্গুণ উপাসনাকেই বুঝায়। গায়ত্রী ধ্যান অর্থে আত্মার বা সচ্চিদানন্দের উপাসনাকে বুঝায়। যিনি আত্মা তিনি দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য 'সৎ' বা পরব্রহ্ম।

যে দ্বিজ এই প্রণব বা ব্যাহৃতি সংযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী মন্ত্র নদীতীরাদি নির্জ্জন প্রদেশে সহস্রবার জপ করেন তিনি সাপের খোলসের ন্যায় মহাপাপ হইতে মুক্ত হন।

শাস্ত্রোক্ত বচন যথা—

সহস্রকৃত্বস্তভ্যস্য বহিরেতৎত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেন সো মাসাৎত্বচে বাহির্বিমূচ্যতে॥

ব্রাহ্মণেরা কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈদিক যাগাদি অন্যকর্ম্ম করুন বা না করুন মৈত্র অর্থাৎ হিংসাশূন্য হইয়া জপপরায়ণ হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। শাস্ত্রের বচন যথা—

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদ অন্যৎ ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

হে মানব! এমন মহৎ ও নিগুর্ণ উপাসনার দ্বারা তোমাদের জীবনের সার্থকতা লাভ কর। গায়ত্রী জপ দ্বারা তোমাদের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব দূর হইবে। তোমাদের হৃদয়ে পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্যোতিঃ আবির্ভাব হইয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে এবং পরমানন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্যজীবন জীবের শ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। মানবের নাভিমূলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই শক্তি বক্রমুখী। জপের দ্বারা সেই শক্তি প্রসারিত হইয়া মেরুদণ্ড অবলম্বন করতঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া হৃদয়ে, কণ্ঠে ও পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতি

লাভ করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করান। মনুষ্যব্যতীত অন্য কোন প্রাণীরই মেরুদণ্ড উন্নত নহে। এই উন্নত মেরুদণ্ড কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির পরিচালক এবং এই শক্তি একমাত্র মোক্ষ লাভের উপায় জানিবে।

মানবদেহের অবসান হইলে উপাসনাসিদ্ধ আত্মার **দেবজন্ম** লাভ হয়। ধর্ম্মপথে থাকিলে মৃত্যুর পর মনুষ্যেরা যে দেবতা হয়েন ঋগ্বেদের মূল সূত্র তাহা ঘোষণা করিতেছে। ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তির মনুষ্যদেহ ধারণ দেবজন্ম লাভের পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া জানিবে। উপাসনাসিদ্ধ আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধ আত্মার মুক্ত অবস্থা আনয়ন করেন এবং দেহান্তে দেবলোকে প্রবেশ করেন। ইহাকে **দেবজন্ম** কহে। এতৎ-সম্বন্ধে মহর্ষি বামদেবের পুত্র মহামতি বৃহদুকৃথ তাঁহার পুত্রের অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে তিনি বলিতেছেন, হে পুত্র! তোমার ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে কিন্তু তোমার মুক্ত আত্মা জ্যোতির্ম্ময় দেবতাদের সহিত মিলিত হউক, তুমি দেবজন্ম লাভ কর। এই মহাবাক্য বিখ্যাত সূক্তরূপে বেদে পরিগণিত হইয়াছে। (ঋগ্বেদ ১০।৫৬) সাংখ্যদর্শনাচার্য্য মহর্ষি কপিলও স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদোক্ত যাঁহারা দেবতা তাঁহারা হয় 'মুক্ত আত্মা' না হয় 'সিদ্ধপুরুষ'। তাঁহার রচিত সূত্র যথা:—

"মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্যবা"

এই জন্য তিনি দর্শনশাস্ত্রে 'জন্য ঈশ্বর' স্বীকার করিয়াছেন। অতএব আমরা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহাতে দেবজন্ম লাভ করিতে পারি সতত তাহারই চেষ্টা করিব। আমাদের দেহ ধারণের উদ্দেশ্য কেবল ইন্দ্রিয়াদির বিষয় ভোগের নিমিত্ত নহে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য দেবজন্ম বা মুক্ত আত্মা লাভ করা। নতুবা বৃক্ষ পত্রের ন্যায় দেহের কেবল উৎপত্তি ও পতন হইয়া লাভ কি? সেরূপ দেহ ধারণ করা আর না করা একই কথা। অতএব এরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা নষ্ট করিও না। সাধুবাক্য স্মরণ কর—

অন্তিমে মুক্তিতে যার না হয় বাসনা
নরদেহ লাভ তার মাত্র বিড়ম্বনা।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

(সংযমে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি)

সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের স্থিরতা লাভ হয়। মন স্থির হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানোদয়

হইলে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, এই জ্ঞানের স্ফুরণ হয় এবং তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের কর্ম্ম ভগবানের শক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। আমরা যাহা কিছু করি তাহার কর্ত্তা আমরা নহি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিষ্ঠা চলিতে থাকিবে। তখন সকল বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইতে থাকিবে এবং সকল দৃশ্যমান জগৎ ইন্দ্র-জালের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। জ্ঞানই আনন্দময় ব্রহ্ম। জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া 'প্রতীক' উপাসনা চলিতে থাকে, পরে আমিই সেই জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'অপরোক্ষ' জ্ঞানলাভ হয়। অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিজ বোধরূপ ব্রহ্ম যে সর্ব্বব্যাপী ইহার নিশ্চয় ধারণা করাই পরোক্ষ জ্ঞান জানিবে। "উহাই আমি" এই নিশ্চয়তাকে 'অপরোক্ষ' জ্ঞান বলে। অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা স্থির নিশ্চয় হয় "অহং ব্রহ্মাস্মি"। অজ্ঞান বা অবিদ্যার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি আছে। যাহা সুন্দর নহে তাহাকেও সুন্দর সাজাইতে পারে যাহা মিথ্যা তাহাকেও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করায় যেমন রজ্জুতে মিথ্যা সর্প জ্ঞান। সর্পরূপ ভ্রান্তি কল্পনা যখনই দূর হয় সত্য যে রজ্জু তাহাই প্রতীয়মান হয়।

অজ্ঞান হইতে কামনা জন্মে। কামনা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বস্তুলাভের ইচ্ছামাত্র। কামনা মনের

ধর্ম্ম, ইহা আত্মার ধর্ম্ম নহে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যখনি মনের সন্নিকটবর্ত্তী হয় তখনই মন সেই সকল বস্তুতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদের আকারে আকারিত হয়। মনের .বিষয়াকার প্রাপ্তিকে **বৃত্তি** বলে, আবার মনের পরমানন্দ লাভকে **প্রেম** বলে। প্রেম সম্বন্ধে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। অতএব যেখানে মনোবৃত্তি সেইখানেই কামনা জানিবে। কামনা ত্যাগ না হইলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। কামনা কিন্তু একবারে ত্যাগ করা যায় না। কামনা দুই প্রকার, শুভ কামনা ও অশুভ কামনা। শুভ বিষয়ে চিত্তের পরিণতি হইলে জীবের কামনা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে এবং অশুভ বিষয়ে চিত্তের পরিণতি হইলে জীবকে বদ্ধ করে। অতএব কামনা যদি একবারে ছাড়িতে না পারা যায় তাহা হইলে শুভ কামনা কর। কিন্তু শুভ কামনাও ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা নিত্যস্থিতি নাই অর্থাৎ জীবন্মুক্তি নাই। ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা কর, ক্রমে কর্ম্মত্যাগ হইবে এবং পরে শুভ কামনাও আপনা হইতেই ত্যাগ হইবে তখন জ্ঞান জন্মাইবে এবং জ্ঞান জন্মাইলেই অজ্ঞান দূর হইবে। জ্ঞান আলোক, অজ্ঞান অন্ধকার, উভয়ে একত্রে থাকিতে পারে না। জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হয়। অতএব

আসক্তিশূন্য হইয়া ও ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, কামনা ত্যাগ হইবে।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে উহাদের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অর্থাৎ ভোগ্য বিষয় জানিবে। ইহাদের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে মন স্ব স্ব বিষয়ের সহিত লয়প্রাপ্ত হইয়া তৎভাবাপন্ন হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণাশ্রিত মন গুণবৃত্তি অনুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে কার্য্যে নিয়োগ করে। মায়া সঙ্কল্পিত মন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চালিত করে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির কার্য্য—যাহার অস্তিত্ব নাই এমন বস্তুকেও কল্পনা করিতে পারে। অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান মায়ার কার্য্য। ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বলশালী। তাহাদিগকে জয় করা ততোধিক কষ্টসাধ্য। আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা ভোগ্য বিষয়ে দোষ দর্শন এবং আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই অনিত্য এবং আসক্তির অযোগ্য উপলব্ধি করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াদি জয় করা যায়। এই ব্যাপার অতিশয় আয়াসসাধ্য। জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্র পাঠাদির দ্বারা বিষয়ের পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করিতে থাকা সত্ত্বেও এবং চিত্তবৃত্তিকে পরমাত্মাতে স্থাপিত করিবার চেষ্টা

করিতেছেন এমন অবস্থাতেও যদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হন তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়কে এমন সুন্দর সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়া মনের নিকট আনয়ন করে যে মন তাহা দেখিয়াই ডুবিয়া যায় এবং সেই সকল বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। কপটাচারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক মেধাবী ব্যক্তির সর্ব্বস্ব যে জ্ঞান তাহা হরণ করে। তখন মেধাবী ব্যক্তিও অজ্ঞানের মত কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়গণ এমনই বলশালী জানিবে। "তস্মাৎ জাগ্রত জাগ্রতো ভবান্" এই সাধু উপদেশ সর্ব্বদা মনে করিয়া কার্য্য করিবে। ইন্দ্রিয়গণ দস্যুস্বরূপ। তাহারা আমাদের পরম কল্যাণকর যে জ্ঞান তাহা লুণ্ঠন করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, অতএব সর্ব্বক্ষণ জাগরিত থাক। সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে থাক।

আর এক কথা, ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ্য বিষয় হইতে এককালীন উপসংহার করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহাদিগকে দোষশূন্য বিষয়ে সংযম সহকারে বিচরণ করিতে দেওয়া মন্দ নহে। কারণ বিষয় ভোগের অভাব-জনিত একটা উৎকট স্পৃহা ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সতত বর্ত্তমান থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা অত্যুগ্রভাবে ভোগ্য বিষয়কে সমালিঙ্গন করিবে। সেই স্পৃহার হীনতা

সাধন করিতে হইলে ভোগের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া থাকে। ভোগলব্ধ বিষয়ের বিচার দ্বারা দোষ দর্শন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তাহা অকিঞ্চিৎকর, হেয় ও অনিষ্টমূলক বলিয়া বোধোদ্দীপক হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানেই ইন্দ্রিয়-গণের লালসা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া শেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দাও, অর্থাৎ শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে শুনিতে দাও, চক্ষুকে দর্শন করিতে দাও, নাসিকাকে আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে দাও, জিহ্বাকে রসাস্বাদন করিতে দাও, ত্বক্‌কে স্পর্শানুভব করিতে দাও এইরূপে যে যার গ্রাহ্যবিষয়কে গ্রহণ করিতে দাও কিন্তু সাবধান তাহাদিগকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে মোহপ্রাপ্ত হইতে দিবে না। রূপ রসাদির গুণে সম্মোহিত না হইলে আসক্তি জন্মাইবে না। আসক্তি নাশ হইলেই বিষয় লাভের চেষ্টা দমিত হইবে। তাহা হইলে বিষয়ের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়গণ বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবাপন্ন হইবে। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠঋষি তাঁহার গীতার ৫ম সর্গের ১ম শ্লোকে বলিয়াছেন—

> ন কুর্য্যাদ্ভোগ সন্ত্যাগং কুর্য্যাদ্ভোগ ভাবনম্।
> স্থাতব্যং সুক্রমেণৈব যথা প্রাপ্তানুবর্ত্তিনা॥

অর্থাৎ দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগের ত্যাগ

করিবে না, এবং কিসে ভোগের আরও বৃদ্ধি হইবে এরূপ চিন্তাও করিবে না। যথাপ্রাপ্তি বিষয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাতে সুখ দুঃখ সমভাবে অবলম্বন করিবে। ঐরূপ শ্রীগীতার জ্ঞানযোগের ১৯ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ"।

অর্থাৎ সংসারের কোন কর্ম্মে কাম্যবস্তু সংগ্রহের সঙ্কল্প না করিয়া কর্ম্ম কর।

একথা কেহ যেন মনে না করেন যে অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত যত্ন করা অবিধেয়। সংসারের অর্থই মূলাধার। তবে অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। "ধনাৎ ধর্ম্ম ততঃ সুখম্"—ধন হইতে ধর্ম্ম. ধর্ম্ম হইতে সুখ উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত ধনের কামনা কর কিন্তু তাহাতে মায়াবদ্ধ হইও না। "অর্থ" সেই স্থানে নিন্দনীয় যেখানে ইহা আত্মাভিমান আনয়ন করে। বশিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন—

"ন কুর্য্যাদ্ভোগ সন্ত্যাগং।"

সংসারের ভোগ্য বস্তু সকল পরিত্যাজ্য নহে। সংসারের ভোগ্য বস্তু কি? তাহা দেহ, গেহ, পরিবার, ঐশ্বর্য্য, সমাজ ইত্যাদি। এই সকলবস্তু উপভোগের দ্বারা

চিত্তকে স্থির রাখিয়া ও আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হও। দারিদ্র্যের তুল্য দুঃখ আর নাই। দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা কর, তাহাতে দোষ নাই। কারণ দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তির সমুদয় সৎগুণ নষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীচ্ছন্দে বলিতেছেন—

দেবস্য সবিতুর্ব্বয়ং বাজয়ং তঃ পুরংধ্যা।
ভগস্য রাত্রিম ঈমহে ॥

অর্থাৎ, হে ভগবান! আমরা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সহিত প্রার্থনা করি আমাদের কর্ত্তব্য আচরণের বল হউক এবং আমাদিগকে সৌভাগ্য দান করুন। তদ্রূপ মহামতি ঋষি গৃৎসমদ্ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রব্যানিধেহিচিত্তং
দক্ষস্য সুভগত্বমঅস্মে।

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন। তিনি আরও বলিতেছেন—

মাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্।

হে রাজন্! অন্যের উপার্জ্জিত অর্থে আমাদিগকে যেন ভোজন করিতে না হয়।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে অতি প্রাচীন কালেও ধন কামনা নিন্দনীয় ছিল না বরং বরণীয় ছিল। ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে তৎকালে সংসার বৈরাগ্য ছিল না।

তবে সেকালের সহিত একালের বিভিন্নতা এই যে সেকালের ধন উপার্জ্জন ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ রূপে পরিগণিত হইত, আর একালে তাহা প্রভুত্ব ও ধর্ম্মহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের কারণ হইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়াছে। এই জন্য ইহা বর্ত্তমান যুগে পরমাত্ম সাধনের অন্তরায় বলিয়া কথিত হয়।

ইন্দ্রিয়দমনের আরও একটি উপায় সংযম। সংযম সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন—

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।

অর্থাৎ সংযম ৫ প্রকার, যথা "অহিংসা," "সত্য," "অস্তেয়," "ব্রহ্মচর্য্য," ও "অপরিগ্রহ"। এই পঞ্চবিধ সংযমের নাম "যম"।

অহিংসা কি? কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা, বা বাক্যের দ্বারা কোন জীবকে ক্লেশ না দেওয়ার নাম অহিংসা।

সত্য কি? জীবের হিতের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহাকেই সত্য বলে। কেবল যথার্থ বাক্য বলাকেই যে "সত্য" বলে তাহা নহে।

অস্তেয় কি? কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা, বা বাক্যের দ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণে যে নিস্পৃহা তাহাকে অস্তেয় বলে।

ব্রহ্মচর্য্য কি ? কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা, বা বাক্যের দ্বারা সকল অবস্থাতে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মৈথুনেচ্ছা পরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া উক্ত হয়।

অপরিগ্রহ কি ? ভোগবিলাসের নিমিত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ বা সঞ্চয় না করা, কেবল মাত্র শরীর রক্ষার উপযোগী বস্তু ভিন্ন আর কিছুরই স্পৃহা না রাখাকে অপরিগ্রহ বলিয়া উক্ত হয়।

এবম্বিধ উপায় সকলকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা যায়। পুর্ব্বে বলিয়াছি ইন্দ্রিয় জয় করা অতীব কষ্টসাধ্য, কারণ তাহারা এতাদৃশ বলশালী যে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইলে আমাদিগকে বহু চেষ্টা ও সংযমের সহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অপরিসীম ধৈর্য্যের ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক। চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।"

অর্থাৎ সম্পদ্ উদ্যোগী পুরুষকেই আশ্রয় দান করেন। সেই উদ্যোগী পুরুষ মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। বিনা উদ্যোগে কোন কিছু লাভ করা যায় না।

"উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

পশুরাজ যে সিংহ তাহাকেও চেষ্টা করিয়া আহার অন্বেষণ করিতে হয়, সে নিদ্রিত থাকিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কোন মৃগ তাহার উদরে প্রবেশ করে না। তদ্রূপ আমাদিগকে ইন্দ্রিয়সংযমের চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলিকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে থাকিলে সংযম আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে এবং সংযম লাভ হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। সেই জ্ঞানই চৈতন্য বা ব্রহ্ম। আর জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বোধ লাভ হইবে। তখন বুঝিবে যে আমি—

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি॥

অর্থাৎ জ্ঞানরূপ-চৈতন্য মহাসাগর সদৃশ। সেই সাগরে যেমন তরঙ্গ উঠে তদ্রূপ চৈতন্যে এই বিশ্ব স্ফুরিত হইতেছে। সেই জ্ঞানরূপ মহাসাগরের চৈতন্যরূপ তরঙ্গই **আমি** জানিবে। তরঙ্গ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্রূপ চৈতন্যরূপ তরঙ্গ আমি জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। তরঙ্গ যেমন জলে মিশিয়া যায় তেমনি আমি চৈতন্য জ্ঞানসাগরে লয় প্রাপ্ত হয়। তবে দীনের মত ইতস্তত আমরা কেন ধাবিত হইয়া থাকি? চাঞ্চল্য দূর কর। সেই চাঞ্চল্য নিবারণের উপায় সংযম অভ্যাস।

সংযম লাভ হইলেই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ হয়। অতএব সংযমই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া অবগত হও।

সংযমে হইয়া পুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান লভি।
মুক্ত হন বদ্ধ আত্মা দেহ ত্যাগ করি॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সাকার উপাসনা।

সংসারাসক্ত অল্পবুদ্ধি লোকদিগের মনেতে নির্গুণ ও নিরাকার বস্তুর ধারণা হওয়া অতীব কঠিন। সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিমূঢ় হইয়া যায়। তাহারা সুস্থির চিত্তে পরমার্থতত্ত্ব শ্রবণ করিতেও অসমর্থ। যদিও কেহ তাহা শ্রবণ করে বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্তই হউক বা চিত্তশুদ্ধির অভাব বশতঃই হউক তাহা বোধগম্য হয় না। এই জন্য সাকারাদি উপাসনা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

স্থূল পদার্থে উপাসনা কার্য্য সাধন নিমিত্ত নিষ্কলঙ্ক, শরীরবিহীন, অদ্বিতীয়, পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। মহর্ষিগণ মানবের বুদ্ধির তারতম্যের জন্য উপাসনাও সগুণ ও নির্গুণ ভেদে বিভিন্ন

করিয়াছেন। পরব্রহ্মকে যখন মায়া শক্তি বিশিষ্ট রূপে কল্পনা করা হয় তখন তিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মক মায়া উপহিত জন্য ঈশ্বর শব্দে উক্ত হন। সেই ঈশ্বর উপাসনাকে সূক্ষ্ম সগুণ উপাসনা বলা যায়। পরব্রহ্মকে যখন মায়া শক্তি বিশিষ্ট রূপে কল্পিত হয় তখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণানুসারে অল্পবুদ্ধি লোকদিগের মঙ্গলের জন্য তাঁহার বিবিধ রূপের কল্পনা করা হইয়া থাকে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥

এক ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক মায়া উপাধি বিশিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিদেব রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

অয়ংহি বিশ্বোদ্ভব সংযমানা—
মেকঃ স্বমায়া গুণ বিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চি বিষ্ণ্বীশ্বর নাম ভেদান্ ॥
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥
(অধ্যাত্ম-রামায়ণ, আদিকাণ্ডে ৫ম অঃ ৫০ শ্লোক)

অর্থাৎ যিনি অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম তিনি একাই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন, ও ধ্বংসের কর্ত্তা। তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ ব্যাপক আত্মা হইয়াও সত্ত্বরজস্তমঃ প্রভৃতি স্বীয় মায়া

গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

অতএব তিনি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা-**ব্রহ্মা**, সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া পালন কর্ত্তা-**বিষ্ণু**, এবং তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বসংহার কর্ত্তা মহাকাল **রুদ্ররূপ** পরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের সকলের **রূপ** ভাবনার জন্য চতুর্ভুজ, চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, পুরুষ আকৃতি ও তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, যথা নারায়ণী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, প্রভৃতি স্ত্রী আকৃতিতে নানা প্রকার **রূপের** কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা সমবেত ঐশাশক্তিরই জ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ নামের বিচিত্রতা মাত্র।

সাকার দেবদেবীর উপাসনাকে স্থূল সগুণ উপাসনা বলা যায়। স্থূল পদার্থের ধ্যানের দ্বারা চিত্ত নিশ্চল হইলে সূক্ষ্ম বস্তুতেও তাহা নিশ্চল হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। জোঁক যেমন এক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অপর দ্রব্য ত্যাগ করে তদ্রূপ সাধক স্থূল পদার্থে মনস্থির করিতে পারিলে সূক্ষ্ম বস্তুকে গ্রহণ করিয়া স্থূলকে ত্যাগ করেন। দেশ, কাল, বস্তু, পরিচ্ছেদ শূন্য ব্রহ্মে মনের স্থিরতা সম্পাদন করা অতীব কঠিন কার্য্য। তজ্জন্য যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি আপনার অধিকার অনুরূপ উপাসনা

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কেবল কল্পিত সাকার দেবদেবীর মূর্ত্তি কেন, পুরুষসূক্তের বিশ্বরূপ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৃণাদি পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থেই তাঁহার বিরাট রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

স্থূল উপাসনার সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বিধান আছে তাহাতে প্রকৃত পক্ষে জড়ের উপাসনা করা হয় না। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যথা—"দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ"। আপনি আপনার উপাস্য দেবতার স্বরূপ হইয়া অভেদ ভাবে দেবতার উপাসনা করিবে। উপাসনার ভূতশুদ্ধাদি প্রকরণে বিশেষ ভাবে বুঝান হইয়াছে যে সাধক উপাসনা কালে এই রূপ জ্ঞান করিবেন যথা—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং
নিত্য মুক্ত স্বভাববান্॥"

অর্থাৎ আমার উপাস্য দেবতা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম, আমা হইতে অভেদ অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ দেবতা। যিনি আমি অন্য ও আমার উপাস্য দেবতা অন্য এই চিন্তা দ্বারা পৃথক ভাবে উপাসনা করেন তিনি পরব্রহ্মকে কখনও জানিতে পারেন না।

শ্রুতি প্রমাণ যথা ঃ—

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং
ব্রুয়াত প্রিয়ং রোৎস্যতীতি।

(বৃহ ১ অধ্যায় ৪ ব্রাহ্মণ, ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করে, তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলিবেন তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

অতএব বুঝিতে হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নানারূপ আমাদের জ্ঞানের বৈচিত্র্য মাত্র কিন্তু সকলের অধিষ্ঠানভূত একমাত্র পরব্রহ্মই উপাস্য। উপাসনা সময়ে শ্রুতিবাক্য 'তত্ত্বমসি' দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ বুঝিতে হইবে। 'তৎ' পদে পরমাত্মা, 'ত্বং' পদে জীবাত্মা ও 'অসি', পদের দ্বারা উভয়ের অভেদ জ্ঞাপন হইয়াছে। এইরূপে নিজ আত্মাকে দ্বৈতভাব রহিত অবগত হইয়া চিন্তা করিবে। যদি সাকার দেবদেবীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিপাদন করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল দেবদেবীকে এক পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা করিতেন না। এসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য যথা—

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।
নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্ম এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই, ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুই নাই। অতএব বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম অনেকরূপ

নহেন। সকল দেবতাতেই অভেদ একব্রহ্মরূপ যে ধ্যান করি ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

ভক্তগণের ভক্তি অনুসারে বিবিধ দেবদেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সকলের মূলে এক পরব্রহ্মের শক্তিতে লক্ষ্য রাখিয়া সাধককে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। যেমন মহাদেবের প্রণাম মন্ত্রঃ—

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥"

তদ্রূপ তাঁহার শক্তিস্বরূপা মহাদুর্গার আকারে সদানন্দ স্বরূপ চৈতন্যের ধ্যান করা হয়। বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধার কল্পে শ্রীদুর্গার স্তবে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে যথা :—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদার বিন্দে।
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে,
নমস্তে মহা যোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দরূপ স্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২॥

মা শরণাগত বৎসলে ! শিবে ! দয়াবতি ! তোমাকে প্রণাম করি। মা ! তুমি জগৎপালিনী, তুমিই বিশ্বরূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছ। মা ! তোমাকে প্রণাম করি। মা ! তোমার পাদপদ্ম জগতে বন্দনা করে, তোমাকে প্রণাম করি। হে জগত্তারিণি ! আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে ! আমাকে পরিত্রাণ কর ।১॥

নিখিল জগৎ তোমার স্বরূপ চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম। মা মহাযোগিনি ! মা জ্ঞানরূপিণি ! তোমাকে প্রণাম। হে সদানন্দ স্বরূপিণি !—হে জগত্তারিণি ! আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে আমাকে পরিত্রাণ কর ॥২॥

তদ্রূপ আবার দেবী নারায়ণীর স্তবে তাঁহাকে যে ভাবে স্তুতি করি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুত্বা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

ভাবার্থ যথা, হে দেবি ! তুমি সর্ব্বভূতা অর্থাৎ সকল জীবে তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ এই কথা যখন অনুভূতা

হও তখন তোমাকে ভোগ মোক্ষদাত্রী বলিয়া তুমি নির্গুণা নিরাকার ব্রহ্মরূপা হইলেও উপাসনার নিমিত্ত তোমাকে সাকার অবস্থাতে স্তব করি। তুমি প্রাণিমাত্রের হৃদয় মধ্যে বুদ্ধিরূপে অবস্থান কর এবং ভোগ ও মোক্ষদান তুমিই করিয়া থাক।

তোমার সনাতন শক্তিতে সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। হে ত্রিগুণাশ্রয়ে। তোমাকে নারায়ণীরূপে নমস্কার করি।

ইহা হইতে বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে যে আমরা মূর্ত্তিপূজা করি না। আকারে চৈতন্যময় ব্রহ্ম স্থাপন করিয়া সেই ব্রহ্মচৈতন্যের ধ্যান করিয়া থাকি। সেই চৈতন্য যে কি রমণীয় ও অনির্ব্বচনীয় তাহা ভাষার দ্বারা কত প্রকারে ব্যক্ত করিয়াও তবুও যেন তাঁহার প্রকৃতরূপ বর্ণনা করা যাইতেছে না। এমনই সুকৌশলের দ্বারা আমাদের দেবদেবীর উপাসনা কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এই জন্য স্ব স্ব চিন্তা ও জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ভগবানকে যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন তাঁহার পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাতেই তাঁহার আনন্দ, এবং আনন্দই ঈশ্বর। যিনি আনন্দলাভ করিতে পারেন তিনি মুক্ত, সংসারের যন্ত্রণাপাশ হইতে তিনি : বিমুক্ত। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইবার সুবিধার জন্যই শাস্ত্র সাকার উপাসনার ব্যবস্থা

করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু সকল দেবদেবীকেই পরম পুরুষ চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয় এবং সকলেই সেই এক ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হইয়া থাকে। বেদেও অনেক দেবদেবীর কথা বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। অতি প্রাচীন "বিশ্বদেব নিবিদ" নামক বেদমন্ত্র তাহার প্রমাণ। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বহুসংখ্যক দেবদেবীর মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন দেবতারা অনেক হইলেও তাঁহাদের সকলেই এক এক আনন্দময় ও প্রেমময় চিৎশক্তি স্বরূপ, তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যের মত কোন বিসংবাদ নাই। তাঁহাদের মিলিত ঐশীশক্তি অবিসংবাদিরূপে একই প্রকার কার্য্য করে। অতএব তাঁহাদের সমবেত শক্তি এক পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া মানিতে হইবে। বেদোক্ত মহাবাক্য যথা :—

"মহৎ দেবানামসুরত্বমেকম্"

দেবতারা অনেক হইলেও তাঁহাদের সকলের শক্তি এক। যেমন সূর্য্য হইতে সহস্র কিরণ রশ্মি বিকীর্ণ হইলেও অধিষ্ঠাতা সেই একমাত্র সূর্য্য ভিন্ন আর কেহই নহেন। উক্ত মহাবাক্য—

"মহৎ দেবানাং অসুরত্বমেকম্।"

বিশ্বামিত্র ঋষির রচিত সূত্রমালার সহিত গ্রথিত হইয়া ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত হইয়াছে। মদীয়

জ্যেষ্ঠ সহোদর পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিরচিত 'বেদ প্রবেশিকা' নামক গ্রন্থের "মধুচ্ছন্দার আজ্যশাস্ত্র" প্রবন্ধে "বিশ্বদেব নিবিদ্" শীর্ষে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। (বেদ প্রবেশিকা ২০৭ পৃষ্ঠা) পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিবেন।

এই সাকার উপাসনা কল্পে আমরা যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

শ্রীগীতার ১৮শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যথা,—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥২৪॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্ অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদ্ আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

আমি করি, এরূপ অহঙ্কার এবং কর্ম্ম ফলের কোন আকাঙ্খা না করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে।

আমি কর্ত্তা, সকলের প্রভু আমিই, এইরূপ দাম্ভিকতা সহকারে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিয়া যে কোন প্রকারে স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজসিক কর্ম্ম বলে।

অবিচার জনিত যে কর্ম্ম যেমন প্রাণী হত্যা, আত্ম প্রশংসা লাভের জন্য যথেচ্ছারূপে ধনক্ষয়, অসংযমিত আচরণে শক্তিক্ষয় ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম যাহার দ্বারা আশু বা ভাবী অশুভ ফলোৎপত্তি হয় তাহাকে তামসকর্ম্ম বলে।

এই প্রকার ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠাতাদিগের বুদ্ধিও তিন প্রকার হইয়া থাকে যেমন সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদবিশিষ্ট যে জ্ঞান তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। ইহার দ্বারা প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নির্ণয় ও কোন্ কর্ম্মের কি প্রকার ফললাভ হয় তাহা নিশ্চয় করা যায়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মাকর্ম্ম বিষয়ে কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অস্থির চিত্তে সংশয়াস্তঃকরণে কার্য্যের অনুষ্ঠান করাকে রাজসী বুদ্ধি বলে।

অল্পবুদ্ধি মানব বিষয়রসে মোহিত হইয়া হৃদয়ে বিষাদ, মোহ, শোক, ভয়, নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি ত্যাগ করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকেই আশ্রয় করে এই যে জ্ঞান তাহাকে তামসী জ্ঞান কহে।

অতএব সাকার উপাসনা যাহাতে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির দ্বারা সম্পাদিত হয় বিধি পূর্ব্বক তাহাই করা কর্ত্তব্য এবং রাজসী ও তামসী বুদ্ধিকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবার জন্য যত্নবান হও। রাজসিক ও তামসিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি প্রমাদে, বিষাদে, মোহে, ভয়ে, শোকে, দুঃখে ও নিদ্রা আলস্যাদি প্রভৃতিতে নিরন্তর কষ্ট পাইয়া থাকে।

সাকার উপাসনার মধ্যে একটি মহৎ ভাব পরিলক্ষিত হয়। সে ভাবটি কি? সেটি "ভয়" ও "ভক্তি"। দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহাদের অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্যশক্তি নানা প্রকারে শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে এবং সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে কোনওটি অতি রমণীয়, চিত্তাকর্ষক, আবার কোনওটি অতি বিকটাকার, ভীতিপ্রদ, অর্থাৎ তাঁহার সংহারকারিণী মূর্ত্তি ও দানব দৈত্যদিগের ধ্বংস সাধন ও তাহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার দর্শনে হৃদয়ে তীব্র ভয়ের উদ্রেক হয়। ভয় হইতে বিষাদ জন্মে। বিষাদ ব্যাকুলতা আনয়ন করে এবং ভয়ব্যাকুল চিত্তে কোন বলশালী মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া মানুষ শান্তি ও সুস্থিরতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান তাঁহার বিশ্বরূপ ভক্ত অর্জ্জুনকে দর্শন করাইলে অর্জ্জুন ভয় বিহ্বল চিত্তে তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির দিকে আর তাকাইতে না পারিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ও অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক

বলিতে থাকিলেন প্রভো ! আর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পারিতেছি না 'ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস'। আপনার মনোহর রূপ দর্শন করান।

ব্যাকুল হৃদয়ে মানব যখন সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষের আশ্রয় লাভের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন তখন দয়াল হরি ভয়ব্যাকুল ব্যক্তির সহায় হয়েন, স্থূল দেহে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দেন ও অভয় প্রদান করেন। শরণাপন্ন ব্যক্তি দর্শন ও অভয় লাভ করিয়া স্বভাবতঃ তাঁহার দাস হইয়া পড়েন এবং সেই সাম্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তির ধ্যান ও পূজা করিতে থাকেন। ইহা যে কিছু বিচিত্র তাহা নহে। এই যে পূজা ইহা ভক্তির কার্য্য, ভজনের ইচ্ছাকে ভক্তি বলে। মহতের কার্য্যে ও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইলে মনে যে ভাব উদয় হয় তাহাকে ভক্তি বলে, ইহার আদিতে থাকে শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস। যাঁহার দ্বারা আমাদের কল্যাণলাভ হয়, আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্ত হই, যিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বরকম বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন, 'তাঁহাকে ভক্তি কর' একথা কাহাকেও বলিয়া শিখাইয়া দিতে হয় না, উহা সততই আপনাহইতে হৃদয়ে উত্থিত হইয়া পড়ে। তবে নিশ্চয় করিয়া জানিতে হইবে আমাদের সর্ব্বরকমে কল্যাণবিধান করেন কে? চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা

যায় তিনি এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ; তিনিই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন। একবার নিজ জীবনে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি তিনি কত বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তিনি আমাদের হৃদয়কন্দরে অবস্থান করিয়া কোন্টা সৎ আর কোন্টা অসৎ বলিয়া দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করাইতেছেন এবং হিতাহিত বোধদ্বারা আমাদিগকে সেই পথে চলিবার জন্য বলিয়া দিতেছেন। ঈশ্বর পরমকারুণিক। জীবের রক্ষার জন্য কতরকম উপায় অবলম্বন করিয়া জীবের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন, ভাবিয়া দেখিলে মন বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমি তাঁহারই ভাষায় বলিতেছি "ঈশ্বর অন্নরূপে তোমার উদরস্থ হইয়া বলাধান করেন, তিনিই আবার অগ্নিরূপে তোমার জঠরে থাকিয়া তোমার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া দেন। পিপাসার জল তিনিই, শ্বাস প্রশ্বাস রূপে তোমার জীবন রাখেন তিনিই—পৃথিবী হইয়া তোমার দাঁড়াইবার স্থান দিয়াছেন তিনিই, তাঁহার দত্ত অগ্নি, জল, বায়ু, ফল, মূল, শাক, অন্ন, লইয়া তুমি বাঁচিয়া আছ। এত উপকার যিনি করিতেছেন তাঁহার উপর কি তুমি কৃতজ্ঞ? যদি

অকৃতজ্ঞ না হও তবে তাঁহার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত তোমায় করিতেই হইবে। আর যদি কৃতঘ্ন হও, বল তোমার সহায় কে হইবে? কৃতঘ্ন হওয়ার মত পাপ আর কি আছে? গোহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। আর দেখ মাতা সাজিয়া উদরে ধারণ করেন তিনিই, পিতা হইয়া পালন করেন তিনিই, সুহৃৎ বান্ধব হইয়া নিরন্তর উপকার করেন তিনিই। বেশ করিয়া বিচার করিয়া দেখ তাঁহার সৃষ্ট জগতে কোথায় না উপকার পাইয়াছ তুমি? কিন্তু কতটুকু কৃতজ্ঞ হইয়াছ? তিনি যাহা নিষেধ করেন তাহা তুমি শুন কি? তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহা কি তুমি পালন কর? সাম্ দাম্ ভেদ্ দ্বারা অবাধ্য-মানুষকে যখন সাধুপথে ফিরাইতে না পারা যায় তখন যেমন অবাধ্যকে দণ্ড দিয়া উপকার করা যায়, সেইরূপ তুমি কুকর্ম্ম হইতে যখন কিছুতেই ফির না তখন দণ্ড দিয়া তিনি তোমাকে তাঁহার দিকে ফিরিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিবার ব্যবস্থা তিনিই করেন কিন্তু তুমি তাঁহার দিকে চাহিয়া কর্ম্মক্ষয় না করিয়া যদি কর্ম্ম বাড়াইতে থাক, বল তখন তিনি তোমার সম্বন্ধে কি করিবেন? কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হয় কি রূপে তাহাও তুমি জানিতে চাও না—এ বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞাও প্রতিপালন

কর না। বল না তখন দণ্ড ভিন্ন তোমাকে সৎপথে আনিবার উপায় আর কি আছে? তুমি জান না কিন্তু তিনি জানেন তুমিও তাঁহার অঙ্গ। সর্প দংষ্ট্র অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দেহ রক্ষা করা কি উচিত নহে? তিনি যে দণ্ড দেন তাহাও তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য। তিনি জানেন তুমি জানিতে চাওনা—তোমার মৃত্যু নাই। এই দেহটা মরিলেও তিনি তোমাকে আবার দেহ দিয়া আবার সাধুপথে চলিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। এমন ক্ষমাসার আর কেহই নাই। বুঝিতে কি পার তিনি সর্ব্বকর্ম্মে মঙ্গলময়?”

এমন নরাধম কে আছে যে এতাদৃশ কল্যাণময় ও ক্ষমাসার ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারে? সেই ভক্তি প্রদর্শনের উপায় মূর্ত্তি উপাসনা। স্তব, স্তুতি, ধ্যান প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গ জানিবে। ফল, ফুল, পত্র, জল ইত্যাদি উপাসনার উপকরণ জানিবে। শ্রীভগবান নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। আমরা সেই সকল মূর্ত্তিতে অনন্ত ও অসীম শক্তি আরোপ করিয়া সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ মহাশক্তিকে, ফল, পুষ্প, জল ইত্যাদির দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং তৎপূজা ভগবান গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার ভক্তদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন ও সৌভাগ্য দান করেন।

শ্রীগীতায় ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, যথা ঃ—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৯।৩১॥

অস্যার্থঃ যথা—যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দ্বারা পূজা করেন সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তির সহিত সমর্পিত বলিয়া তৎসমুদায় আমি সাদরে গ্রহণ করি। ৯।২৬॥

দুরাচার হইলেও আমাকে ভজনা করিলে সে আশু ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং সর্ব্বদা শান্তিলাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় রূপে জানিবে, যে আমার ভক্ত তাহার কখন বিনাশ হয় না অর্থাৎ তাহাকে আমি সর্ব্বরকমে রক্ষা করি।

"যাঁহারে জানিলে পরে, মৃত্যু ভয় নাহি করে,
জ্ঞান জ্যোতিরূপে নাশে অজ্ঞানান্ধকার।
তুমি সেই "জ্ঞেয় আত্মা" করি নমস্কার"।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রেম।

(মোক্ষ লাভের উপায়)

প্রেম কি? ইহা এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত ধারা যাহা প্রত্যেক জীব মাত্রেরই অন্তঃকরণে ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহমান রহিয়াছে। ইহা মধু অপেক্ষাও মধু, প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়। এই অমৃতময়ী প্রেম বিশ্বসংসারে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহা অনাদি, অনন্ত, নিরাকার কিন্তু শক্তিরূপে প্রত্যেক জীবে পরিলক্ষিত হয়। এক পরমেশ্বরই এই প্রেমের আকর। এই জন্যই তাঁহাকে প্রেমময় বলা হয়। এক প্রেম শক্তির দ্বারা তিনি জীবকে সমাকৃষ্ট রাখিয়াছেন। শ্রীভগবান মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া প্রেমের অদ্ভুত ও অলৌকিক লীলা বিশ্ব সংসারে প্রচার করিয়াছেন। জীবের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয় কন্দরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে প্রেমের তরঙ্গে নাচাইতেছেন, খেলাইতেছেন, প্রেমের আবর্ত্তনে ইহ সংসারের দুঃখ কষ্টকেও মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় কে না দগ্ধ হইতেছে? তবুও দেখা যায় তাহারই মধ্যে একটু প্রেমানন্দ আছেই, সে যতই কেন সামান্য হউক, তাহাতেই

সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ভুলাইয়া দিয়া জীব সকলকে আনন্দদান করে, দুঃখময় জীবনকেও মধুময় করে। প্রেম এমনি ইন্দ্রজাল জানিবে।

আমরা জননীর অন্তঃকরণে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান প্রেমের অভ্যুদয় অধিক পরিমাণে দেখিতে পাই। সেই প্রেমই সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে। জননী একটি মন্দির বিশেষ। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই মন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়া আপন অনির্ব্বচনীয় কৌশলে আমাদের অপূর্ব্ব রক্তমাংসের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বাংশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া আমাদের জীবন রক্ষার জন্য জননীর বক্ষে পীযূষ-ধারা প্রবাহিত করিয়া থাকেন। আমাদের রক্ষার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্যের চুম্বক ঘর্ষণ করিয়া দেন। তখন জননী আমাদের অভিমুখে অনিবার্য্য স্নেহশৃঙ্খলে আকৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে লালন পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। গর্ভাবস্থায় জননী কতই না যন্ত্রণা ভোগ করেন, প্রসব সময়ে তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হয় কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তদ্দর্শনে তাঁহার সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। প্রেমের এমনি আত্মবিস্মরণ শক্তি আছে জানিবে। যাহাকে ভালবাসা যায় তাঁহার প্রীতি জন্মাইতে পারিলে কি আনন্দ! প্রেমের যিনি পাত্র বা পাত্রী তাঁহার সুখে আমাদের কি সুখ বোধই না হয়! প্রেমের

যিনি পাত্র বা পাত্রী তাঁহার জন্য ক্লেশও সুখদান করে। লৌহের শিকলকে সোনার শিকল করিতে পারে কেবল এক প্রেম। যে সুখের পরিণাম কেবল নিজের সুখমাত্র তাহা নিকৃষ্ট সুখ জানিও আর অন্যের সুখ বিধান করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট সুখ। সেই সুখ অনুভূতির নাম **প্রেমানন্দ।**

প্রেমের শক্তি অদ্ভুত। সূর্য্য আমাদের দিনকে দীপ্তি দেন,চন্দ্র আমাদের রাত্রিকে জোৎস্না দেন,কিন্তু এক প্রেমই আমাদের জীবনের চন্দ্র সূর্য্য। প্রেম না থাকিলে সূর্য্যের আলোকেও এই পৃথিবী অন্ধকার হইত, চন্দ্রের আলোকেও অন্ধকার হইত। ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি যদি কাহাকেও ভাল বাসিতে না পার আর তোমাকেও যদি কেহ ভাল বাসিতে না পারে তোমার কি দশা হইবে? তখন আমরা বিকটাকার রাক্ষস সাজিয়া আপনা-আপনি পরস্পরকে সংহার করিয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইব। পরমাণুর আকর্ষণ শক্তিতে যেমন সমুদয় পদার্থ গঠিত হইয়াছে, তেমনি মানব হৃদয়ের প্রেমশক্তিতে এই বিশ্বসংসার গঠিত। পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি যেমন এক অদ্ভুত **জড়শক্তি**, মানব-হৃদয়ের প্রেমশক্তি তেমনি এক অদ্ভুত **আত্মশক্তি**। যেমন এক আকর্ষণশক্তিতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তেমনি এক প্রেমশক্তি

নরনারীকে স্ব স্ব সংসার রচনা করাইয়া তন্মধ্যে স্থাপন ও রক্ষা করিতেছে। আকর্ষণ শক্তি চলিয়া গেলে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি যেমন খসিয়া পড়িবে, তেমনি প্রেমশক্তি অন্তর্দ্ধান করিলে পরিবার, সমাজ, সাম্রাজ্য প্রভৃতি কুয়াশার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। অতএব **প্রেমই আমাদের এই মনোহর সংসাররূপ অট্টালিকার সুপ্রশস্ত ভিত্তি জানিবে।**

ঈশ্বরের এই সংসার প্রেম শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কেমন সুমধুর দেখ দেখি। এই শিক্ষায় আয়াস নাই, ক্লেশ নাই, অবসাদ নাই। এ শিক্ষায় একবারে মাতাইয়া তোলে, ইহার কণামাত্র আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জীবসকল উন্মত্ত হইয়া পড়ে, উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আস্বাদ গ্রহণের জন্য লালায়িত হয়। প্রেমোন্মত্ত দেবর্ষি নারদ, ভক্তপ্রাণ প্রহ্লাদ ধ্রুব, চৈতন্য ও প্রেমাবতার যিশুখৃষ্টও মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ, এবং প্রোমোন্মাদিনী ব্রজবালাগণ ইহ সংসারে প্রেমের অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ মাত্রে জীবের কল্যাণ সাধন হয়। প্রেমের সোপান দিয়াই আমরা স্বর্গে আরোহণ করিতেছি। সংসারের ধনই বল, আর মানই বল, প্রেম বিনা সকলই বিফল। ঈশ্বরের এই প্রেমের রাজ্যে প্রেরিত হইয়া আমরা প্রেম শিখিতেই আসিয়াছি।

বাল্যে জননীর স্নেহে হৃদয়ে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয়, ভাই ভগ্নির ভালবাসায় পল্লবিত হয়, ধর্ম্মপত্নীর ভালবাসায় কুসুমিত হয়, সন্তানের ভালবাসায় ফল সংযুক্ত হয়। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, পুত্র, কন্যার প্রেম জলের তরঙ্গের মত বিস্তার পাইয়া প্রতিবেশী, স্বদেশী, বিদেশী এমন কি নিকৃষ্ট পশু পক্ষীর উপরেও ছড়াইয়া পড়ে। প্রেম সার্ব্বজনীন হৃদয়স্থিত মহাদ্রাবক বিচিত্র সলিল স্বরূপ। ইহার দ্রাবকতা গুণ এতই প্রবল যে, যে কোন বিসদৃশ বস্তু ইহার মধ্যে নিপতিত হইলে তাহা লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহা প্রেমে মিশ্রিত হইয়া প্রেমময় হইয়া পড়ে। তখন মানব পৃথিবীতে আর কিছুই কুৎসিত দেখিতে পায় না, তখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু অনির্ব্বচনীয় লাবণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যাহা মন্দ তাহাও ভাল হইয়া যায়, পাপ তাপ পৃথিবী হইতে পলায়ন করে।

আবার প্রেমকে ধর্ম্মের মূল বলিয়া অবগত হও। প্রেমশূন্য ধর্ম্ম যেমন, **"ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন রন্ধন"**। ধর্ম্মোপাসনা করিতে হইলে প্রেম ব্যতিরেকে উপাসনা সিদ্ধ হয় না। প্রেম অর্থে অনুরাগ বুঝায়, কারণ **অনুরাগ প্রেমের ধর্ম্ম**। প্রেমের যিনি পাত্র বা পাত্রী তাঁহার প্রতি প্রেম এমনি দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয় যে তাহার কিছুতেই

গতিরোধ করা যায় না। সর্ব্বদাই সেই প্রেম প্রতিমার সন্দর্শন লাভের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া থাকে, এমন কি অদর্শন জনিত দুঃখ প্রেমপ্রতিমার চিন্তাতেও সুখ দান করে। চিত্তে প্রেমের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রেম মহাদ্রাবক। যিনি প্রেমে আকৃষ্ট হন তিনিও প্রেমিকের প্রেমে আত্মহারা হন। প্রেমিক ও প্রেমানন্দক উভয়েই এক হইয়া পড়েন। আমরা যে দিন সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় ভাল বাসিতে শিখিব, সে দিন কি শুভদিন! কি আনন্দের দিন! সে দিন আমাদের নূতন জন্ম, যে জন্মের নাম **দেবজন্ম।**

ক্ষমা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি যে সকল মানবের মহৎগুণ 'প্রেমই' সকলের মূলাধার। আবার দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবের যে সকল সৎগুণকে হরণ করে 'প্রেমই' তৎসমুদয়ের ধ্বংসসাধক। অতএব প্রেম ধর্ম্ম-সাধনের যেমন মহৎ উপায় তেমনি উহা সংসার মার্গের পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া অবগত হও। শত্রুকেও ভালবাস, যে তোমাকে হিংসা করে সে কৃপার পাত্র, সে অজ্ঞান, দুর্ব্বল পশু মাত্র। তুমি যদি তাহাকেও ভাল বাসিতে পার তবেই তুমি তাহা হইতে উৎকৃষ্ট। হিংসক যদি পশু হইল তবে তাহার প্রতি হিংসা করিলে আমরাও

তাহারই মত পশুর শ্রেণীভুক্ত হইলাম। সে যেমন অজ্ঞান, দুর্ব্বল পশু, আমরাও তেমনি অজ্ঞান, দুর্ব্বল পশু হইলাম, আর যদি তাহাকেও ভাল বাসিতে পারিলাম তবেই না আমাদের উৎকর্ষ। দেখ ঈশ্বরের প্রেম আমাদের উপর কিরূপ। আমরা তাঁহার কতই অবাধ্য, তিনি যাহা বলেন তাহা আমরা করিনা, তিনি যাহা নিষেধ করেন তাহা আমরা করিয়া থাকি। আমরা কতই না অন্যায় করিতেছি তা বলিয়া তিনি কি আমাদের মস্তকে বজ্রপাত করিতেছেন? মনে করিলে ত পারেন তবে করেন না কেন? যেমন অসহায় অজ্ঞান শিশু সন্তানকে পিতা মাতা ভাল বাসেন, সে কোলে বসিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিলেও তাঁরা বিরক্ত হন না তেমনি ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার অজ্ঞান অসহায় পুত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একদিন না একদিন আমাদের জ্ঞান হইবে বলিয়া জননীর মত প্রেমের সহিত পালন করিতেছেন। আমরা যদি তাঁহার সুসন্তান হইতে বাঞ্ছা করি তবে নিকৃষ্ট মনুষ্যদের হস্তে ক্লেশ পাইলেও তেমনি বিরক্ত হইব না। আমাদের ভ্রাতা ভগিনীরা আপন আপন দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া মন্দ করিলেও হিংসা দ্বেষ না করিয়া তাহাদের কিসে জ্ঞান হইবে তাহাই চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রেম এক অদ্ভুত অমৃত প্রবাহিনী ফল্গু

নদীর সদৃশ, ইহাতে নানা প্রকার ভাবের বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে কেবল সত্ত্বগুণের বুদ্‌বুদাকার যে প্রেম তাহারই আলোচনা করা হইল। রজঃ তম গুণের দ্বারা উত্থিত যে প্রেম তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কহে, তদ্দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধিত হয় না। প্রেমের অত্যুগ্র শক্তি রজস্তমগুণকে এতাদৃশ উত্তেজিত করে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও বুদ্ধিনাশ ঘটে, তিনি অজ্ঞানীর মত কার্য্য করেন। এতাদৃশ প্রেমিক নিন্দনীয় বলিয়া জানিও। উহাতে প্রেমরাজ্যের রাজা যিনি ঈশ্বর, তাঁহাকে খুসী করা যায় না।

যে দিন আমরা ভগবদ্ প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হইব, যে দিন আমরা সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে পারিব, যে দিন আমরা প্রেমকে জগৎ পালক বলিয়া বুঝিতে পারিব সে দিন আমাদের কি শুভদিন! সেদিন আমাদের জন্য স্বর্গবাসীগণ আনন্দ উৎসব করিবেন, অলক্ষে আমাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন, মা কমলা আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। তখন আর পৃথিবীতে আমরা কিছুই কুৎসিত দেখিতে পাইব না, সকল বস্তুই অনির্ব্বচনীয় লাবণ্যে পরিপূর্ণ হইবে।

হে মানব! তুমি এক প্রেমের সাধনার দ্বারা জীবন্মুক্ত হও, প্রেমরাজ্যে ভুমিষ্ঠ হইয়া দেবজন্ম

লাভ কর এবং প্রেমময় যে হরি তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে প্রার্থনা কর, হে দয়াময় হরি !

কর মোরে প্রেমিকের প্রেমিক প্রধান
সাধিতে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ।

পরে সদা ভাল বেসে
পরের সুখের আশে
চির আত্ম বিসর্জ্জন চির আত্মদান—
হৃদিতলে বহে যেন প্রেমের তুফান।

প্রাণ খোলা মন খোলা
প্রেমেতে আপনা ভোলা
প্রেমময় হেরি যেন জগৎ সংসার,
ঘুচে যাক্ ভেদাভেদ হ'ক্ একাকার ॥

শ্রীহরির কৃপায় আমাদের হৃদয় মধ্যে যখন বিশ্বপ্রেম জাগরিত হইবে তখন আমাদের চক্ষু যাহা কিছু দর্শন করিবে সকলি মধুময় হইবে। তখন আমরা শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের চক্ষের দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকেই দেখিতে থাকিব যে প্রেমের প্রস্রবণে বিশ্ব সংসার প্লাবিত হইতেছে এবং তন্মধ্য হইতে উত্থিত আনন্দধ্বনি শুনিতে শুনিতে বল্লভাচার্য্যের সহিত সমস্বরে গাহিতে থাকিব :—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পানির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

করণং মধুরং তরণং মধুরং
হরণং মধুরং রমণং মধুরং।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচি মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

গোপা মধুরং গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট অধ্যায়।

পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নিগু‍র্ণায় ॥১॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥২॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা প্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বৈরনিন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব
জগদ্ভাস কাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥৪॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫॥

শ্রীরামরক্ষা কবচম্

—ঃ০ঃ—

রামং দুর্ব্বাদল শ্যামং
পদ্মাক্ষং পীতবাসসম্।
স্তুবন্তি নামভির্দিব্যৈঃ
নতে সংসারিণো নরাঃ ॥১॥

রামংলক্ষ্মণপূর্ব্বজং
রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণার্ণবং
গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্ ॥২॥

রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং
দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকভিরামং
রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥৩॥

রামায় রামভদ্রায়
রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায়
সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৪॥

শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম
শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রণকর্কশ রাম রাম
শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম ॥৫॥

শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ মনসা স্মরামি
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ বচসা গৃণামি।
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শিরসা নমামি
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপদ্যে ॥৬॥

মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ
স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্রঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালুঃ
নান্যং জানে নৈবজানে নজানে ॥৭॥

দক্ষিণে লক্ষ্মণো যস্য
বামে চ জনকাত্মজা।
পুরতো মারুতির্যস্য
তং বন্দে রঘুনন্দনম্ ॥৮॥

লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং
রাজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং
তং শ্রীরামচন্দ্রং শরণ্যং প্রপদ্যে ॥৯॥

মনোজবং মারুত তুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরাম দূতং শরণং প্রপদ্যে ॥১০॥

ভবান্যষ্টকম

—ঃ০ঃ—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্নদাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া না বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥১॥

ভবাব্ধাব পারে মহাদুঃখ ভীরুঃ
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
সংসার পাশ প্রবদ্ধঃ সদাহম্
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকাভবানি ॥২॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান যোগং,
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র মন্ত্রম্।
নজানামি পূজাং ন চ ন্যাস যোগং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৩॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ!
গতিস্ত্ব গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৪॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য প্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৫॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৬॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে ।
অরণ্যে শরণ্যে সদামাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৭॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাড্য বক্ত্রঃ,
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৮॥

প্রার্থনা।

—ঃ০ঃ—

জগৎকর্ত্রি জগদ্ধাত্রি জগতাং পরিপালিকে।
অতি দীনং মতি হীনং পাহি মাং দেবি ত্রিপুরে ॥১

জপ পূজাং ন জানামি নাস্তিমে তপসঃ ফলম্।
"ত্রি-পূ-রা" ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং কেবলং মম সম্বলম্ ॥২

পাপ তাপ দগ্ধ দেহং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ম্।
দেহি মে শীতলং মাতঃ শ্রীপাদপঙ্কজদ্বয়ম্ ॥৩

কিং করোমি কুত্রযামি দেহান্তে কা দশা মম।
ইতি চিন্তা ব্যাকুলোঽহং মহাপাপো নরাধমঃ ॥৪

মাত্রচিৎ দয়ামাতঃ যদি তে সংভবিষ্যতি।
নিস্তার কারণং তদ্ধি ত্বমেকা মে পরাঃ গতিঃ ॥৫

পুত্রো পরাধাতা মাতা কদাচিৎ যদি কুপ্যতি।
ক্ষমা প্রার্থন মাত্রেণ স্বাঙ্কে স্থানং প্রযচ্ছতি ॥৬

জগতাং জননীত্বং ভো দয়াময়ী ক্ষমাবতী।
মূঢ় পুত্রস্যাপরাধাৎ ক্ষমা কিং ন ভবিষ্যতি ॥৭

সাষ্টাঙ্গে প্রণতোভূত্বা যাচেঽহং কাতরস্বরে।
ক্ষমস্ব মম পাপানি রক্ষ মাং চরণোত্তরে ॥৮

———

প্রণাম মন্ত্র

ত্বমাদ্যরূপঃ পুরুষঃ পুরাণঃ,
ন বেদ বেদস্তবসার তত্ত্বম্ ।
অহং ন জানে কিমু বচ্মি কৃষ্ণ !
নমামি সর্ব্বান্তরসংপ্রতিষ্ঠম্ ॥

ত্বমেব বিশ্বোদ্ভবকারণং সৎ,
সমাশ্রয়স্তং জগতঃ প্রসিদ্ধঃ ।
অনন্তমূর্ত্তিরদঃ কৃপালুঃ,
নমামি সর্ব্বান্তরসং প্রতিষ্ঠম্ ॥

বদামি কিন্তে সবিশেষতত্ত্বং,
ন জানে কিঞ্চিত্তব মর্ম্ম গূঢ়ম্ ।
ত্বমেব সৃষ্টি স্থিতি নাশকর্ত্তা,
নমামি সর্ব্বান্ত রসংপ্রতিষ্ঠম্ ॥

আলোচ্য বিষয়ের বর্ণমালা অনুসারে

সূচীপত্র।

সমাপ্ত

REVIEW.

The Hon'ble Mr. Justice Manmata Nath Mukerji M.A., B.L.

High Court of Judicature at Fort William in Bengal and a Member of the Syndicate of the Calcutta university.

29. *January* 1933.

With very great pleasure have I gone through the book "Jnanapraveshika" by Rai Sahib Mahim Chandra Batavyal. The book purports to be an introduction to the teachings of Vedantic Philosophy and gives a glimpse of the foundations on which it is based. The discoveries of modern science and the discussions of moral principles by the great thinkers of to-day have revealed how deep and broad based these foundations are. The object-of the book is to attract young minds to a study of those problems and to enable them to realise how their own individual existence is linked with the chain of existence emanating from the Prime Source and ultimately merging into It. The humane interest is disclosed in the last chapter in which it is shown how Love Divine permeates the whole world Phenomena,—a realisation which gives strength to the mind and cheers the heart amidst the gloomy out look of sorrows, privations and disappointments, which apparently cloud our existence.

I think the book should be largely untilised for the education of our students in order

to impress into their minds the seeds of true knowledge or at least to create in their minds an aptitude for further study on a subject, which is unquestionably important, useful and ennobling,

Sd/ M. N. Mukerji

6 Old Post-Office Street,
Calcutta.
The 9th January 1933.

Dr. Sir Deva Prasad Sarvadhikari,
C. I E, C. B. E, M. A, L. L D.
Late Vice-chanceller of the University of Calcutta.

Jnan-Prabeshika by Rai Sahib Mahim Chandra Batavyal is an interesting and instructive work, worthy of careful study by the young and old alike. It is replete with high ideals and moral lessons supported by well chosen Sastrik Texts in clear and lucid Bengali, which will be of great use to all Seekers in the present reactionary age. Mr Batavyal who has made a mark in public service as Registrar of Assurances, Calcutta, is a brother of the late erudite Vedic scholar Mr. Umes Chandra Batavyal and is to be congratulated on the excellence of the style and substance of the work, an index of the piety and learning that have always run in the family.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

Dated Calcutta, 22nd January 1933.

HINDU PHILOSOPHY.

"Jnanpraveshika" (Sadhanar Dhan) by Rai Sahib Mahim Chandra Batavyal-Published by Babu Prakash Chandra Batavyal from Durgabati, 1, Dayal Banerjee Road, Baje Shibpur, Howrah. Pp. 114. Price eleven annas.

Rai Sahib Mahim Ch. Batavyal (younger brother of the late erudite Vedic Scholar Mr. Umesh Ch. Batavyal) is already known to the public as the Registrar of Assurances, Calcutta. But uptil now we had no idea that he is also a great Sanskrit scholar deeply imbued with the philosophic principles of the East. We have, therefore, great pleasure in introducing him to our readers as the author of a little manual of Hindu Philosophy, written in the Bengali language.

The interest of this small book is out of all proportion to its size. It is a primer of Hindu Philosophy, not only indispensable to every thoughtful reader, but also invaluable as a source of suggestions for making further progress in the field of ancient Indian Thought.

The work opens with a brief account of the Upanishadic doctrine of Cosmogony, and deals with the theories about the origin and the functions of the sense-organs, the method of

controlling them, the process of Pranayama, the mysticism of Omkara and the Gayatri Hymn, the mode of worshipping a Personal God, the Intuitional Knowledge of Brahmah and the value of Devotion (Divine Love which leads to final Emancipation). It concludes with a few simple Sanskrit hymns carefully selected to suit the different tastes of general readers. Lastly, there is an Index of subjects appended to the work which makes the book quite up-to-date.

We congratulate the worthy author who has succeeded remarkably well in keeping up the traditions of his family ; and we are glad to have this opportunity of strongly urging all our readers to study this book, which by its style and substance is sure to occupy a prominent position in the philosophical literature of the Bengali language.

THE LIBERTY.

Dated Calcutta, 25th December, 1932.

JNAN PRAVESIKA—By Rai Shaheb Mahim Chandra Batabyal (Pages 114, price Eleven annas—published from Durgabati, 1 Dayal Banerjee Road, Howrah).

In this interesting little book the learned author has lucidly explained the tenets of Hindu religion contained in the Vedas and the Gita. He has in a masterly way shown that even in the highly materialistic atmos-

phere of the modern world it is possible to live a religious life. The first chapter of the book is devoted to a clear exposition of the theory of creation, the second to an intimate study of the origin of man's body and mind and their relation to each other, the third to the efficient control of the senses and the development of the spirit and the subsequent chapters to the practice of those religious exercises which are necessary to the attainment of peace and ultimate salvation (Moksha). The book is notable for the author's grasp of his subject and for its high literary qualities. The language is simple and clear and beautiful without being too ornate. Wherever the author formulates conclusions of his own, he has had them supported by apt quotations from the scriptures. A number of hymns for daily recitation are given in the seventh and last chapter, and there is a subject-index at the end which will be found convenient and useful.

THE ADVANCE

Dated Calcutta, 30th October, 1932.

The book is an attempt to make the sublime truths of the Gita accessible to common understanding The learned author has with profuse quotations explained the ways of attaining wisdom and ultimately salvation in the light of the teachings of the Gita. The book will be found useful to those who are

interested in religion and to whom the original Gita appears to be too abstruse. We have come across a number of printing mistakes which we hope will be corrected in the subsequent edition. Get-up is simple and decent.

বঙ্গবাসী

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ ।

জ্ঞান-প্রবেশিকা। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বটব্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, হাওড়া ১নং দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় রোড, দুর্গাবাটী হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র বটব্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৶০ এগার আনা।

বিদ্যাশিক্ষার জ্ঞানলাভই মুখ্যলক্ষ্য; কিন্তু আজকাল সমাজে যে লেখাপড়া হয়, তাহাতে জ্ঞানের সম্পর্ক নাই, এজন্য উহাকে লেখাপড়া বলিয়া জ্ঞানিগণ মনেই করেন না। জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় আমাদের আর্য্যশাস্ত্র-আর্য্যগ্রন্থ অধ্যয়ন। কিন্তু সে সকল এত বড়—এত দীর্ঘকালসাধ্য যে, সর্ব্বাংশ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভের পথে প্রবেশ করা কলির অল্পায়ু মানবের পক্ষে অসম্ভব। এহেনসময়ে, এরূপ দুঃসময়ে এরূপ সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ গ্রন্থ বিশেষ আবশ্যক। গ্রন্থকার ঠিক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পুস্তক সম্পাদন করিয়া জ্ঞানপিপাসুর পানীয় অন্বেষণের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন! এই বটব্যাল বংশ শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ বিখ্যাত; ইংরাজী বিদ্যায়ও সবিশেষ অগ্রসর। ইনি কলিকাতার রেজিষ্ট্রার এবং ইঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। এত ইংরাজী শিক্ষার মধ্যেও ইঁহাদের সংস্কৃত শিক্ষার নিষ্ঠা কম ছিল না; উমেশচন্দ্র "বেদপ্রবেশিকা" ও "সাংখ্যদর্শন" সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, ইঁহার এই

জ্ঞান-প্রবেশিকায়ও আমরা ইঁহার বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। স্কুলে পড়ার সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশের জন্য যেমন "প্রবেশিকা" প্রণীত হইয়াছে, তেমনি গহন জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপানস্বরূপ এই গ্রন্থ বটব্যাল মহাশয় প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বিষয় সঙ্কলন ও সহজভাবে সরল ভাষায় তাহা বুঝাইবার অধ্যবসায় প্রশংসার্হ। অতি কঠিন সৃষ্টিতত্ত্ব তিনি বেশ সরল ভাষায় বুঝাইয়াছেন, আস্তিক্যবুদ্ধি আনয়ন ও ভগবান বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করাইতে হইলে ভগবদ্‌বিভূতির পরিচয় চাই, সৃষ্টিতত্ত্বে তাহা আছে; এই জন্যই গ্রন্থকার প্রথমে তাহা দেখাইয়াছেন, তদানুষঙ্গিক দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি, স্থিতি ও তাহাদের গুণাগুণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ পরপর যেরূপ ভাবে অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ ভাবেই জ্ঞানতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়সংযম, প্রাণায়াম, প্রণব ও গায়ত্রীরহস্য, সংযমে ব্রহ্ম জ্ঞান, সাকার উপাসনা ও মোক্ষলাভের উপায় প্রেমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আপনার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে আপনার পরিজনের প্রতি অল্প অল্প ভালবাসা প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া কিরূপে বিশ্ব প্রেমিক হওয়া যায়, তাহার দুই একটী সরল দৃষ্টান্ত সহকারে গ্রন্থকার অতি মধুর অবতারণা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে কতিপয় স্তোত্র প্রার্থনাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রচ্ছদপটে প্রণবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত একটী চিত্র আছে। প্রণবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের অধিষ্ঠান, ত্রিবর্ণের ইহাই মূল কারণ। প্রণব বিষয়ক জ্ঞানঅধিকারিভেদে আলোচ্য, পাঠ্য ও পরিজ্ঞেয়, অধিকারী অবশ্য আনন্দ পাইবেন। ১১০ একশত দশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এখন দিকে দিকে শিক্ষা পরিবর্ত্তনের প্রয়াস প্রচেষ্টা চলিতেছে, জ্ঞানের শিক্ষা করিতে হইলে এই পুস্তক বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিবে। এখন এমন কাল পড়িয়াছে যে, অনেক বালকের পিতাও ইহা হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিবেন। আমরা এ গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি।

বিশ্বদূত

(হাওড়া গেজেট)

১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় জ্ঞান-প্রবেশিকা নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। মাত্র ১১৪ পৃষ্ঠায় তিনি যেরূপ মহৎতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় সংযম ও মুক্তি সম্বন্ধে এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন যে তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য। দুঃখময় সংসারের মধ্যে বাস করিয়া কি ভাবে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায় তাহার উপায় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। গুণত্রয় বিভাগ এবং গুণানুসারে মানবের যে কর্ম্মের তারতম্য দেখা যায় ইহা পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানবদেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি যে জড় ও অনিত্য তাহা নানা শাস্ত্র বাক্যের দ্বারায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ম্মই মনুষ্য জন্মের হেতু ইহা প্রতিপাদন করিয়া কর্ম্মের যে প্রকার ভেদ নির্ণয় করিয়া বুঝাইয়াছেন তাহা সকলেরই জানিবার বিষয়। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, হৃদয়ে পূর্ণ বল, বিমল আনন্দ, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও সংসারের সুখ দুঃখে উপেক্ষা বুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে অথচ অতি সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। সেই মনের সংযম কি কি উপায় অবলম্বনে সাধিত হয় তাহা নানা প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। মনঃ সংযমের দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি হয় এবং সেই জ্ঞানই যে মোক্ষ প্রদান করে এই পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়।